অপারেশন রেড হেরিং

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এই লেখকের অন্যান্য বই

কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি

জানমারি

তখন কুয়াশা ছিল

নদীর মতন

নিষিদ্ধ অরণ্য

প্লাবন

বাসস্থান

বিপজ্জনক ১১

রানীরঘাটের বৃত্তান্ত (গল্প)

রেশমির আত্মচরিত

সংশপ্তক

হেমন্তের বর্ণমালা

বৈশম্পায়ন রায়

এক সন্ধ্যায় অনেকদিন পরে মুনলাইট বারে ঢুকেছিলাম। আজকাল আর আগের মতো নিয়মিত মদ্যপান করি না। কোনও কোনও দিন মন খারাপ থাকলে বড় জোর তিন পেগ টানি। বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। জানি না, বৃষ্টি আমার মন খারাপের কারণ কি-না।

চৌরঙ্গিপাড়ার এই বারটা ছোট হলেও ছিমছাম, ভদ্র, শান্ত। দরদাম অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশি। আসলে যাঁরা নিরিবিলি নিঝুম পরিবেশে এবং শালীনতার মধ্যে থেকে মদ্যপানের অনাবিল আনন্দ পেতে চান, তাঁদের জন্য মুনলাইট চমৎকার।

দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড একজন লোক কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে নজর রাখে। মাতলামির সূচনা দেখলেই সে সামনে এসে দাঁড়ায়। নিচু গলায় চলে যেতে বলে। না গেলে সে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। অ্যাংলোইন্ডিয়ান এই লোকটির নাম চাংকো।

কয়েক চুমুকের পর সিগারেট ধরিয়েছি, কেউ আমার টেবিলের সামনে এসে বসল। আস্তে বলল, "এক্সকিউজ মি! যদি আমি ভুল না করে থাকি, তুমি বাসু না?"

ওকে দেখামাত্র চিনতে পারলাম। সমীর রুদ্র। পঁচিশটা বছর সামান্য সময় নয়। পঁচিশ বছরে পৃথিবীতে অনেকরকম ঘটনা ঘটে গেছে। অনেককিছু ওলটপালট হয়েছে। সমীরকে শেষবার দেখেছি কবে? ভাবতে গিয়ে মাথার ভেতর ঠাণ্ডাহিম ঢিল গড়িয়ে গেল। মুখ নামিয়ে গেলাসে চুমুক দিয়ে বললাম, "সরি! আপনি ভুল করেছেন!"

সমীর আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওর দু'চোখে নেশার ঘোলাটে ছাপ দেখতে পেলাম। সে হঠাৎ হাসল। "নাহ্! আমি ভুল করিনি। তুমি বাসু। আরে বাবা! এই তো সেদিনকার কথা। তুমি

দাড়ি-ফাড়ি রেখে মোটকু হয়েছ। চোখে চশমা-টশমা এঁটেছ! তাই বলে কি আমি চিনতে পারব না? হুঁ, ফরেনের সাহারি খেয়ে হেল্‌থ্‌ ফিরিয়েছ। ক'বছর ছিলে যেন? সেভেন অর এইট ইয়ার্স?"

তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। এই বারে ঢোকার সময় ওকে লক্ষ করিনি কেন? এখন আর কিছু করার নেই। এই সন্ধ্যায় নিয়তি আমাকে মুনলাইটে টেনে এনেছে।

"বাসু! পাস্ট ইজ পাস্ট। ডেড ইজ ডেড।" সমীর আরও হাসল। "আজকাল অবশ্য শেক্সপিয়ারের ভাষায় 'ফেয়ার ইজ ফাউল অ্যান্ড ফাউল ইজ ফেয়ার।' যাই হোক, কাম টু দা পয়েন্ট! অনি! অনিকে নিয়েই তো ব্যাপার। সো হোয়াট? আরে বাবা, আমি কি তোমাকে—"

হেঁচকি তার কথা বন্ধ করল। বেশ কয়েক পেগ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় দুটো কাজ আমি করতে পারি। তাকে অনর্গল কথা বলতে দিতে পারি। তা হলে চাংকো ওকে বাইরে নিয়ে যাবে। কিংবা আমি উঠে যেতে পারি।

কিন্তু গেলাস শেষ না করে উঠে গেলে কে কী ভাববে! বললাম, "প্লিজ ডোন্ট ডিসটার্ব মিস্টার!"

সমীর বলল, "তুমি সুখে আছ। আমিও মন্দ নেই। আমার বউ পালিয়ে গেছে। তোমার হয়তো যায়নি। এই তো ডিফারেন্স। ফ্রেইলটি! দাই নেম ইজ উওম্যান। মেয়ে নিয়েই রামায়ণ-মহাভারত-ট্রয়ের যুদ্ধ। ওক্কে বাসু! অনির সঙ্গে আমার বিয়ের পিঁড়িতে বসার কথা ছিল। ফস্কে গেল। যাক্‌। তার জন্য দুঃখ করিনি। তো তুমি মাইরি—"

গেলাস শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। আমার শরীরের ওজন বেড়ে গিয়েছিল। বললাম, "এগেন সরি মিস্টার! য়ু আর টকিং টু আ রং পার্সন।"

"যা বাবা!" সমীরও উঠে দাঁড়াল। "রং পার্সন? মে বি। অনি আমাকে বলত, তুমি রং পার্সন! তা হলে রাইট পার্সন কে? প্রশান্ত? হ্যাঁ। কিন্তু শেষে প্রশান্তও রাইট পার্সন হতে পারল না। বাসু, উই দা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স আর অল রং পার্সন।"

চাংকো এগিয়ে এল। তাকে বললাম, "ইট ইজ অল রাইট চাংকো!" তারপর কাউন্টারে একটা পঞ্চাশটাকার নোট রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেলাম।

কালো অ্যাম্বাসাডার আস্তে ড্রাইভ করছিলাম। মনে হচ্ছিল একটা অচেনা শহরের রাস্তায় হারিয়ে যাচ্ছি।

একটু পরে দেখি, মৌলালি পেরিয়ে, সি আই টি রোড ধরে চলেছি। নিজের

ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম। কোথায় যাচ্ছি আমি ? নিয়তি আমাকে তুলে নিয়েছে।

পঁচিশ বছর আগে আমার বয়স ছিল পঁচিশ। অনির বয়স বড়জোর উনিশ বা কুড়ি। অনি আমাকে বলেছিল, "কলেজ থেকে বেরিয়েই বিয়ের মুখে পড়ার মানে হয় না। আমার মা তত সেকেলে মানুষ নন; কিন্তু আমার মামাটি একেবারে শকুনিমামা।"

অনি আমার কাছে কি পরামর্শ চেয়েছিল ? জানি না। তখন আমি পরামর্শ বিশেষজ্ঞও ছিলাম না এখনকার মতো। এখন আমি ফরেন ট্রেডিং কনসালটান্সি খুলেছি। সারা পৃথিবী চক্কর খেয়ে কলকাতায় ফিরেছি গত জানুয়ারিতে। এখন অনেক লোককে পরামর্শ দিতে পারি। তখন আমি প্রায় নিঃসম্বল এক আনাড়ি যুবক।

আসলে হয়তো অনিকে আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তার ওপর একটা চাপা ক্ষোভই এর কারণ।

তার আগের বছর দীঘা বেড়াতে গিয়ে সে এক কেলেংকারি।

দীঘার হোটেল দা শার্কের ১৭ নম্বর ঘরের এপিসোডটি আমার খুব ভেতরকার একটি যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। কতকাল তার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। ব্যর্থতার যন্ত্রণা যে কত ভয়ংকর হতে পারে, আমি জানি।

অনির প্রেমে তখন আমি এত অস্থির যে কোনও হঠকারিতায় পিছ-পা ছিলাম না। সব রকমের ঝুঁকি নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম।

দীঘা যাওয়ার প্রস্তাবটা যখন অনিকে দিই, ধরেই নিয়েছিলাম অনি সরাসরি না করে দেবে।

কিন্তু আমার বুক কাঁপিয়ে সে এক কথায় রাজি হয়ে গেল। কথাটা সে ঠিক বুঝেছে কি-না যাচাই করার জন্য বললাম, "তুমি আর আমি একা যাচ্ছি কিন্তু।"

অনি আমাকে আরও অস্থির করে বলল, "হ্যাঁ, একাই তো ভাল। দল থাকলে বড্ডবেশি হইচই হয়। তুমি তো জানো বাসুদা, আমি ওসব একেবারে পছন্দ করি না!"

"কিন্তু মাসিমা তোমাকে একা যেতে দেবেন তো ?"

"কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে এক্সকারসনে যাচ্ছি বলব।"

হোটেল দা শার্কের সতের নম্বর ঘরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার সমুদ্র দেখছিল অনি। ব্যালকনির আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ওকে আদর করতে গেলাম। অনি চমকে উঠে সরে গেল। "এ কী করছ বাসুদা! তুমি এত অসভ্য তা তো

জানতাম না ?"

"অনি, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"আশ্চর্য ! ভালবাসলে অসভ্যতা করতে হয় বুঝি ?"

"তুমি একে অসভ্যতা ভাবছ কেন ? এটাই তো ভালবাসার ভাষা, অনি !"

"আমি ওসব ভাষাটাষা বুঝি না। তুমি আমাকে ওভাবে ছোঁবে না।"

একটু রাগ হল। বললাম, "তুমি-আমি এই হোটেলে স্বামী-স্ত্রী বলে নাম লিখিয়েছি। তোমার সিঁথিতে সিঁদুর।"

অনি ফুঁসে উঠল। "তুমি বললে এটা ট্রিকস। স্বামী-স্ত্রী না হলে রুম পাওয়া যাবে না।"

আমার মেজাজ চড়ে গেল। "তুমি নেকি ! তুমি আমার সঙ্গে একা চলে এলে। তুমি জানো না—জানতে না এভাবে আসার কী মানে ?"

অনি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। "কিন্তু আমি তো সমুদ্র দেখতে এসেছিলাম। আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি। সমুদ্র দেখার জন্য তুমি আমার কাছে দাম চাইছ বাসুদা ? আমি তোমাকে এমন খারাপ তো ভাবিনি !"

সে একটা অসহ্য রাত। অনি কিছু খেল না। সারা রাত ব্যালকনিতে বসে কাটিয়ে দিল।

পরে এই এপিসোডটা খুঁতিয়ে স্মরণ করতাম আর বুঝতে চাইতাম, অনি কি সত্যি নিছক সমুদ্র দেখার জন্য এই ঝুঁকি নিয়েছিল, নাকি হঠকারিতার পর নিজেকে সামলে নিয়েছিল ওভাবে ? অনির মধ্যে একটা রহস্য ছিল। অথবা অনি সেই দলের মেয়ে, যারা জানে না কী করতে কী করে বসছে ?

শিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের কাছে বাস্তব-অবাস্তবের সীমানা মুছে যায়। অনি হয়তো জন্ম-শিজোফ্রেনিক ছিল। সে জানত না, সে কী করছে।

অনির মায়ের ইচ্ছা ছিল আমিই অনিকে বিয়ে করি। কথাটা আমার কানে এলে সঙ্গে সঙ্গে না করে দিয়েছিলাম। তাই সমীর রুদ্র অনির কাছাকাছি এসে পড়ে। সমীরকে সামনাসামনি খুব পাত্তা দিত অনি ; কিন্তু পেছনে আমার কাছে ওর বদনাম গাইত। কারণ সমীর ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মস্তানটাইপ ছেলে। ওকে সে ভীষণ ভয় পেত। দীঘার এপিসোড সম্পর্কে অনি নিজেই একদিন আমাকে বলেছিল, "ভাগ্যিস তুমি ! অন্য কেউ হলে আমার সাংঘাতিক সর্বনাশ হয়ে যেত। তোমার বিবেক আছে, বাসুদা !"

অনি আমার বিবেক থাকার কথা বলেছিল। আমি জানতাম না, আমার মধ্যে বিবেক আছে। তারপর থেকে সেই বিবেক আমাকে যখনতখন চিমটি কাটে।

ডানদিকে গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে গেলাম। এই তো সেই গোড়াবাঁধানো বটগাছটা; তার পাশে একতলা বাড়ি ছিল। সেখানে পাঁচতলা বিশাল একটা বাড়ি। গেট বন্ধ। বটতলার কাছে একটা টালির ঘরে জামা-কাপড় ইস্ত্রি করছিল একটা লোক। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়ে মকান কিসকা হ্যায় ?"

"কৈ আগরওয়ালসাবকা।"

"হেঁয়া এক ছোটা মকান থি। এক মা আউর এক লড়কি থি। খেয়াল হাঁয় ?"

"জি। উও মাইজি তো বহত সাল আগে মর.গেয়ি।"

"লড়কিকি খবর ?"

"মুঝে নেহি মালুম, সাব! আউর কিসিকো পুছিয়ে!"

বাড়ি ফেরার পথে নিজেকে চড় মেরে সায়েস্তা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। এটাই তো নিয়ম। সবকিছু বদলে ওলট-পালট হয়ে গেছে। আবার কেন পিছু ফিরে খোঁজা ?

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। পরদিন সব বড় ইংরেজি-বাংলা দৈনিক পত্রিকার অফিসে গিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে এলাম। অতিরিক্ত চার্জ দিয়ে জরুরি বিজ্ঞাপন। দুদিন পরে বিজ্ঞাপনটা বেরুল।

'অনামিকা সেন,
তুমি যেখানেই থাকো সাড়া দাও।
—বাসুদা।
বক্স নং....'।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে কাগজগুলো থেকে কয়েকটা চিঠি দিয়ে গেল। প্রত্যেকটি কাগজ থেকে একটি করে খাম। খামের ভেতর একটি করে চিঠি। প্রত্যেকটি চিঠিতে লালকালিতে লেখা আছে :

'বৈশম্পায়ন রায় ওরফে বাসুকে সাবধান করা যাইতেছে, সে যেন অনামিকা সেন সম্পর্কে এতটুকু কৌতূহল প্রকাশ না করে। করিলে তাহার সাংঘাতিক বিপদ হইবে।'

ছ'খানা খামের ভেতর একই কাগজে একই কালিতে লেখা একই চিঠি।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে রইলাম। সমীর রুদ্রের সঙ্গে দৈবাৎ যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল। তাকে পাত্তা না দিয়ে ভুল করেছি। তাকেই এখন সবচেয়ে বেশি

দরকার।

মুনলাইটে গিয়ে চাংকোর কাছে শুনলাম, সে তাকে সেদিন সন্ধ্যায় বের করে দিয়েছিল। কাজেই এ বারে তার আসার চান্স নেই।

এলাকার প্রায় প্রত্যেকটা বারে অনেকগুলো সন্ধ্যা কাটিয়েও সমীরকে আর খুঁজে বের করতে পারলাম না। প্রতি সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে অনির কথা ভাবি আর মাথার ভেতর আগুন ধরে যায়। জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছি। এই চ্যালেঞ্জটার সামনে দাঁড়াতে পারব না?

গতরাতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার এক পুরনো বন্ধু অরিজিৎ লাহিড়ির কথা। সে পুলিশ অফিসার! সম্ভবত আই পি এস। এখন কোথায় আছে সে? টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুলে বসলাম।

লাহিড়ি এ। ডি সি ডি ডি।

কিন্তু একই নম্বরে অনেকগুলো নাম। আগে রিং করে জেনে নেওয়া যাক পুরো নামটা অরিজিৎ লাহিড়ি কিনা।

অনেকক্ষণ রিং হল। কেউ সাড়া দিল না। তখন ১০০ নম্বরে লালবাজারে ডায়াল করলাম। সাড়া এল। হ্যাঁ, এ লাহিড়ি অরিজিৎ লাহিড়ি। তবে এখন তাঁকে পাওয়া যাবে না।....

জয়ন্ত চৌধুরি

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ খি খি করে হেসে উঠলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল হালদার মশাই? হাসছেন কেন?"

"হাসব না?" হালদারমশাই কাগজের পাতায় লম্বা তর্জনী রেখে বললেন, "লিখছে, মশার কয়টি দাঁত আছে? ৪৭টি। হঃ! গুনল কেডা? মশয়? আইজকাইল এই কুইজ-কুইজ ধান্দা পোলাপানগো সর্বনাশ কইরা ছাড়ব। আবার লিখছে, মাকড়সার জাল লম্বা করলে কত মাইল হয়? ৫০০ মাইল। কেডা লম্বা করল? খালি ধান্দাবাজি।"

হালদারমশাই কাগজ ভাঁজ করে সোফার কোণের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর একটিপ নস্যি নিলেন। মনে হল, হাঁচবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু হাঁচি এল না। রুমাল বের করে নাক মুছে আপনমনে বললেন, "চাইরদিকে খালি ধান্দাবাজি।"

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একটা ঘাসফড়িংয়ের রঙিন ছবির ওপর আতস কাঁচ

রেখে কী সব দেখছিলেন। বললেন, "হালদারমশাই ঠিকই বলেছেন। তবে—"

ওঁর কথার ওপর বললাম, "তবে ধান্দাবাজির অনেক ডাইমেনশন আছে। যেমন, প্রায় আধঘন্টা ধরে একটা গ্র্যাসহপারের চিত্রদর্শন!"

"ডার্লিং! এটা সিস্টেসার্কা গ্রেগরিয়া প্রজাতির ফড়িং। এদেরই পঙ্গপাল বলা হয়। এরা মূর্তিমান সর্বনাশ।" কর্নেল ছবিটা টেবিলে রেখে আতসকাচ চাপা দিলেন। "যাই হোক, হালদারমশাই আজকের কাগজের একটা সেরা ধান্দাবাজি মিস করেছেন।"

কথাটা শুনেই গোয়েন্দাভদ্রলোক সিধে হয়ে বসলেন। উত্তেজিতভাবে বললেন, "মিস করছি?"

"হ্যাঁঃ।" কর্নেল সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন। "এডিটোরিয়্যাল পেজের চিঠিপত্রের কলামে একটা চিঠি আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে।"

হালদারমশাই বাঘের থাবায় কাগজটা তুলে নিলেন। একটু পরে দেখলাম, ওঁর চোখদুটো গোল হয়ে গেছে। গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপছে। বিড়বিড় করে বললেন, "মড়া সিগারেট টানবে? মানে, ডেডবডি! কয় কী!"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে ওঁকে তাতিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "চ্যালেঞ্জ হালদারমশাই, পাল্টা চ্যালেঞ্জ করেছে।"

হালদারমশাই নিজের বুকে আঙুল রেখে বললেন, "আমারে?"

কর্নেল হাসলেন। "না, না! আপনাকে চ্যালেঞ্জ করবে কেন? আমার মনে হচ্ছে, আপনি খুঁটিয়ে চিঠিটা পড়েননি।"

হালদারমশাই ফের কাগজে চোখ রাখলেন। প্রায় বানান করার মতো বিড়বিড় করে পড়ে মুখ তুললেন। বাঁকা হেসে বললেন, "ম্যাজিক! ম্যাজিক!"

"কিন্তু অবধূতমশাই পাল্টা চ্যালেঞ্জ করেছেন। বিজ্ঞান প্রচার সমিতির প্রদীপ মিত্রকে যেন ডুয়েল লড়তে ডেকেছেন। ওঁর তন্ত্রশক্তি বুজরুকি প্রমাণ করতে পারলে আশ্রম ভেঙে দিয়ে সেখানে মুলোর চাষ করবেন।" কর্নেল গম্ভীর মুখে মাথার টাকে হাত রাখলেন। "শুধু তাই নয়, উনি সন্ন্যাসধর্ম ছেড়ে দিয়ে বাকি জীবন প্রদীপ রায়ের চাকর হয়ে থাকবেন। বুঝুন তা হলে?"

"হঃ! বুঝছি।" হালদারমশাই আরেকটিপ নস্যি নিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী বুঝলেন, বলুন শুনি?"

"কর্নেলস্যার তো অলরেডি কইয়া দিলেন ধান্দাবাজি।"

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললেন, "হ্যাঁ, ধান্দাবাজি। কারণ অবধূতমশাইয়ের দ্বিতীয় শর্ত হল, প্রদীপ মিত্র হেরে গেলে নিজের চ্যালেঞ্জ

অনুসারে তাঁকে একলক্ষ টাকা দিতে হবে।"

গোয়েন্দা কে কে হালদার নড়ে বসলেন। "প্রদীপ রায় কইছিল লক্ষ টাকা দেবে ওনারে ?"

"চিঠিতে তো তা-ই দেখছি। তার মানে, প্রদীপ মিত্রের চিঠিটা আমি মিস করেছি।" কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানতে টানতে বললেন। "মিস করার একটাই কারণ। আমি গত সেপ্টেম্বরে প্রায় পুরো মাসটাই নাইজেরিয়ায় ছিলাম। তবে জয়ন্তের চোখে পড়া উচিত ছিল। চিঠিটা ওদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় বেরিয়েছে।"

বললাম, "নিজের লেখা রিপোর্ট বাদে সত্যসেবকের আমি কিছুই পড়ি না।"

হালদারমশাই ভুরু কুঁচকে বললেন, "ক্যান ?"

"হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে, ঘরকি রোটি তিতা/পরকে রোটি মিঠা। আমি অন্য কাগজ পড়ি।"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক খি খি করে খুব হাসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, "এই যে কাঁটালিয়াঘাট লিখছে, হোয়্যার ইজ দ্যাট প্লেস কর্নেল স্যার ?"

কর্নেল বললেন, "কেন ? আপনি কি প্রদীপ রায়ের হয়ে চ্যালেঞ্জটা পেতেন ভাবছেন ?"

"নাহ্। এমনি জিগাই।"

"হাওড়া-আজিমগঞ্জ লুপলাইনে গঙ্গার ধারে কাঁটালিয়াঘাট রোড স্টেশন। কাটোয়ার কাছে উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানের পর অমন শ্মশান আর গঙ্গার ধারে নেই—অন্তত পশ্চিমবঙ্গে।" কর্নেল এতক্ষণে চোখ খুলে সোজা হলেন। "ও তল্লাটে 'কাঁটালেঘাটের মড়া' বলে একটা কথা চালু আছে। কোনও-কোনও মড়া নাকি চিতা থেকে উঠে পালিয়ে যায়। কাজেই বলা যায় না, অবধূতমশাইয়ের যে-মড়াটা সিগারেট টানবে, সেটা তেমন কোনও চিতা-পালানো মড়া কিনা।"

কর্নেলের কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম। হালদারমশাই কিন্তু হাসলেন না। হাই তুলে ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। আনমনে বললেন, "যাই গিয়া।" তারপর পর্দা তুলে জোরে বেরিয়ে গেলেন। এই ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে একটা ছোট্ট ওয়েটিং রুম। তারপর বাইরে বেরুনোর দরজা। দরজায় ইন্টারলকিং সিস্টেম আছে। ভেতর থেকে খোলা যায়। কিন্তু বাইরে থেকে খোলা যায় না। সেই দরজায় বেশ জোরালো শব্দ হল।

বললাম, "হালদারমশাইকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। সোজা হাওড়া

স্টেশনে ট্রেন ধরতে গেলেন না তো ?"

কর্নেল বললেন, "গেলে একটা এক্সপিরিয়েন্স হতেও পারে। পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের রিটায়ার্ড ইন্সপেক্টর আমি অনেক দেখেছি, জয়ন্ত ! কিন্তু আমাদের এই হালদারমশাইয়ের মতো কাউকে দেখিনি; সবসময় রহস্যের গন্ধ শুঁকে বেড়ানো ওঁর বাতিক হতে পারে। তবে এটা খারাপ বাতিক নয়। এতে সৎ মানুষদের উপকার করা হয়। ওঁর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খোলার পেছনে—"

বাধা দিয়ে বললাম, "বাতিক আপনারও কিছু কম নয়। তবে ঘন্টার পর ঘন্টা একটা পাখি বা প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়ানোতে যদিও কারও কোনও উপকার হয় না।"

"হয় জয়ন্ত, নিশ্চয় হয়। এই যে দেখছ, এই পঙ্গপালটা ! নাইজেরিয়ায় এটার পেছনে অনেক ছুটোছুটি করে ছবি তুলে এনেছি। তুমি জানো না, এরা সারা আফ্রিকার কী সাংঘাতিক শত্রু। লক্ষ লক্ষ টন ফসল মাঠ থেকেই এদের পেটে চলে যায়। গাছপালা পর্যন্ত মুড়িয়ে খেয়ে ফেলে। মরুভূমি ডেকে আনে এরা। সাহারা মরুভূমির অন্যতম স্রষ্টা এরাও, জয়ন্ত। এই সিস্টেসার্কা গ্রেগরিয়া প্রজাতির ফড়িংকে তুমি নিরীহ জীব ভেবো না।"

আমার প্রকৃতিবিদ্ বন্ধুর ভাবাবেগ লক্ষ করে অবাক হয়েছিলাম। ওঁর আবেগপূর্ণ বক্তৃতা আরও কিছুক্ষণ চলত। থামিয়ে দিল ডোরবেলের টুংটাং বাজনা। বললাম, "হালদারমশাই কিছু ফেলে গেছেন হয়তো।"

কর্নেল বললেন, "যদি কিছু না মনে করো, ভদ্রলোককে নিয়ে এসো ডার্লিং !"

"কোন ভদ্রলোককে ?"

"যিনি এসেছেন। দেখবে, মুখে সুন্দর দাড়ি আছে। আমার মতো লম্বাচওড়া।"

অবাক হয়ে বললাম, "আপনার কি দেয়াল ফুঁড়ে দৃষ্টি যায় ?"

কর্নেল হাসলেন। "জয়ন্ত ! ডোরবেলের শব্দ আমাকে বলে দিয়েছে কে এসেছেন। তা ছাড়া ঠিক সাড়ে দশটায় ওঁর পৌঁছুনোর কথা।"

বেরিয়ে গিয়ে দরজার আইহোলে চোখ রাখলাম। কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মুখে পোড়খাওয়া ভাব। চোখে সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা। লম্বায় প্রায় কর্নেলের মতোই। দরজা খুলে একটু সমীহ করে বললাম, "আসুন !"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি কি কর্নেল সায়েবের অ্যাসিস্ট্যান্ট ?"

"নাহ্। আমি জয়ন্ত চৌধুরি। নিছক একজন সাংবাদিক।"

"আমার নাম ভি রায়। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কনসালট্যান্ট।"

"ভেতরে আসুন। কর্নেল আপনার অপেক্ষা করছেন।"

ভি রায় ড্রয়িং রুমে ঢুকে কর্নেলকে দেখে যেন একটু নিরাশ হলেন। নমস্কার করে বললেন, "আপনি কর্নেল সরকার?"

"আপনি বসুন মিঃ রায়! সকালে আমাকে অরিজিৎ ফোনে আপনার কথা বলেছে।"

রায় সায়েব সোফায় বসলেন। ব্রিফকেসটা পাশে রেখে বললেন, "অরিজিৎ প্রেসিডেন্সিতে আমার বন্ধু ছিল। আমি অবশ্যি ওর সিনিয়র ছিলাম। এনিওয়ে, ও আপনাকে কী বলেছে জানি না।"

কর্নেল হাঁকলেন, "ষষ্ঠী! কফি।" তারপর বললেন, "অরিজিৎ বলেছে, আমার পক্ষে সম্ভব হলে যেন আপনাকে সাহায্য করি। কী একটা মিসটিরিয়াস ঘটনার মধ্যে নাকি আপনি জড়িয়ে গেছেন। তো আমি ওকে বললাম, বরং প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে কে হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলো। অরিজিৎ আসলে হালদার মশাইকে পছন্দ করে না। আপনি আসার জাস্ট দু-তিন মিনিট আগে ডিটেকটিভ ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। সম্ভবত নীচে আপনি ওঁকে দেখে থাকবেন।"

"আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নন?"

কর্নেল গম্ভীরমুখে কথা পাড়লেন। "সরি মিঃ রায়! আমি ডিটেকটিভ নই। অরিজিৎ কি আপনাকে বলেছে আমি—"

রায় সায়েব তাঁর কথার ওপর বললেন, "না। অরিজিৎ বলল, আপনি ছাড়া এই মিস্ট্রি কেউ সল্‌ভ্‌ করতে পারবে না।"

"মিস্ট্রিটা কী, সংক্ষেপে বলুন।"

রায় সায়েব একটু ইতস্তত করে বললেন, "বাট দিস ইজ প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল!"

কর্নেল আমাকে দেখিয়ে বললেন, "জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।"

"আলাপ হয়েছে। কিন্তু—"

"ওর কাছে আমার কিছু গোপন থাকে না। যদি ওর সামনে বলতে আপত্তি থাকে, তা হলে সরি মিঃ রায়, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমারও গোপনে শুনতে আপত্তি আছে।"

রায় সায়েব আমাকে দেখে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। "তাই বুঝি!

তবে খবরের কাগজের লোক বলেই—ঠিক আছে ! অরিজিৎ যখন আপনার কথা বলেছে, তখন আই মাস্ট ফলো হিম।"

রায়সায়েব ব্রিফকেস খুলতে ব্যস্ত হলেন। ষষ্ঠীচরণ কফির ট্রে রেখে গেল। কর্নেল একটু হেসে বললেন, "কফি খেতে খেতে বলুন মিঃ রায়। কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে। আমার ধারণা, আপনি খুব ডিস্টার্বড্।"

কয়েকটা খাম এবং বিজ্ঞাপনের কাটিং কর্নেলের হাতে তুলে দিয়ে রায় সায়েব কফির পেয়ালা নিলেন। চুমুক দিয়ে বললেন, "থ্যাংকস ! সত্যিই আমি ভীষণ ডিস্টার্বড্। আমার জীবনটা অনেকগুলো অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে কেটেছে। অনেক সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে পড়েছি। কিন্তু এবারকারটা একেবারে অন্যরকম। আমি ভাল করে খেতে বা ঘুমোতে পারছি না। কোনও কাজকর্মে মন বসছে না। এ একটা অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ।"

কর্নেল কাগজগুলো দেখতে দেখতে বললেন, "অনামিকা সেনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী ?"

"পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি শুনুন আগে।"

"বলুন।"

ন্যাশনাল জিওগ্র্যাফিক পত্রিকার পাতায় চোখ রেখে একটা অদ্ভুত কাহিনী শুনছিলাম। পঁচিশ বছর আগে সমীর রুদ্র নামে একজনের সঙ্গে অনামিকা সেনের বিয়ের সম্পর্ক হয়েছিল। বিয়ের আগের রাতে অনামিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। রায় সায়েব তখন একটা কোম্পানিতে চাকরি করতেন। জামসেদপুরে ছিলেন। ঘটনাচক্রে সমীর রুদ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর পুরনো কথা মনে পড়ে। তারপর অনামিকাদের বাড়ি গিয়ে দেখেন, সেখানে একটা বিশাল বাড়ি উঠেছে। অনামিকার মা বহুবছর আগে মারা গেছেন। অনামিকার খোঁজে রায় সায়েব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তার জবাবে হুমকি দিয়ে চিঠি এসেছে, অনামিকার খোঁজ করলে তাঁর সাংঘাতিক বিপদ হবে।

কর্নেল বললেন, "অনামিকার সঙ্গে আপনার এমোশনাল সম্পর্ক ছিল ?"

"একসময় আমার দিক থেকে ছিল। এটুকু বলতে পারি। তবে সেটাও সাময়িক।"

"অনামিকার খোঁজ নিতে এতকাল পরে আপনি আগ্রহী। কেন ?"

রায়সায়েব একটু উত্তেজিতভাবে বললেন, "বিয়ের আগে সে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। সে কথা তো বললাম আপনাকে। তবে এটা ঠিক যে, এই হুমকি না এলে আমি এ নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামাতাম না।"

"এমন তো হতে পারে, অনামিকা নিজেই হুমকি দিয়ে চিঠি লিখেছেন ?"

রায়সায়েব একটু চুপ করে থেকে বললেন, "হুমকির কোনও দরকার তো ছিল না। সে জানাতে পারত, ভাল আছে এবং তার জন্য আমাকে চিন্তা করতে হবে না।"

"ওঁর হাতের লেখা আপনার কাছে আছে ?"

"নাহ্। তবে এই লেখাগুলো কিছুতেই ওর নয়। মেয়েদের লেখা বলে মনে হয় না।"

"কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। কোনও পুরুষ মানুষকে। এমন তো হতেই পারে। তিনিই এখন অনামিকার স্বামী।"

"স্বীকার করছি। কিন্তু অনি তো আমাকে পছন্দ করত না। পরে আমিও ওকে আর পছন্দ করতাম না। ওর সঙ্গে বিয়ের কথা উঠেছিল। আমিই না করে দিয়েছিলাম। কাজেই অনি ভালই জানে যে, আমি এই বয়সে ওর পেছনে লাগতে যাব না।"

কর্নেল ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কি সন্দেহ করছেন, অনামিকা—"

"আমার সন্দেহ, অনামিকা বেঁচে নেই। সি ওয়জ কিল্‌ড্। তাই তার কিলার চাইছে আমি যেন তার খোঁজে পা না বাড়াই। ডু য়ু আন্ডারস্ট্যান্ড কর্নেল সরকার ?"

আমি চমকে উঠেছিলাম। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে চুরুট ধরালেন। "সমস্যা হল মিঃ রায়, খুব পুরনো কোনও মার্ডারের খোঁজখবর করা আমাদের দেশে বস্তুতঃ অসম্ভব।"

"মার্ডারের নয়, মার্ডারারের খোঁজ পেতেই আমার আগ্রহ কর্নেল সরকার! রায়সায়েব ডানহিল সিগারেট ধরালেন। "যদি সত্যিই অনিকে কেউ খুন করে থাকে, সে আমার বিজ্ঞাপন দেখেই ভয় পেয়ে গেছে বলে আমার সন্দেহ।"

"য়ু আর ভেরি ইনটেলিজেন্ট ম্যান, মিঃ রায়।"

"একটা বোকামি আমি করে ফেলেছি। সমীর রুদ্র যখন মুনলাইট বারে আমাকে দেখে চিনতে পেরেছিল, আমি তাকে না চেনার ভান করে কেটে পড়েছিলাম। এখন আপনি বলুন, ওকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে বিজ্ঞাপন দেব কি না ?"

"দিয়ে দেখতে পারেন।" কর্নেল লালকালিতে লেখা চিঠিগুলোর ওপর আতস কাচ রেখে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন।

রায়সায়েব বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে বললেন, "সরি ! ভুলে গিয়েছিলাম। অরিজিৎ বলছিল, অনির কোনও ফোটো আছে কি না। অনেক খুঁজে এই ফোটোটা পেয়েছি। পুরনো ফোটো। নষ্ট হয়ে গেছে। দেখুন, যদি দরকার হয়—"

কর্নেল স্যাঁতলাধরা আবছা পোস্টকার্ড সাইজ ছবিটা নিয়ে বললেন, "সত্যিই অনামিকা খুন হয়ে থাকলে ওই সময়ের পুলিশ রেকর্ড বা খবরের কাগজে তাঁর ছবি থাকা সম্ভব। অবশ্য বডি যদি কেউ সঙ্গে সঙ্গে শনাক্ত করতে না পারে, তবেই। কিন্তু বডি নিখোঁজ হলে কিছু করার নেই। তার চেয়ে বড় কথা, অনামিকার বডি শনাক্ত করার জন্য তখন তাঁর আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত লোকেরা ছিলেন। আপনার বন্ধু সমীর রুদ্র ছিলেন। অথচ সমীরবাবুর কাছে আপনি তেমন কিছু শোনেননি ?"

"না।"

"তাহলে যদি আপনার সন্দেহমতো অনামিকা খুন হয়েই থাকেন, তাঁর বডিও নিখোঁজ হয়েছিল।"

"য়ু আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট, কর্নেল সরকার !"

কর্নেল হাসলেন। "সেক্ষেত্রে ছবি আমাদের কোনও সাহায্য করছে না।"

রায় সায়েব আস্তে বললেন, "কিন্তু যদি সে বেঁচে থাকে ?"

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। দেন ইটস্ আ রিয়্যাল মিস্ট্রি।"

ন্যাশানাল জিওগ্র্যাফিকের পাতা থেকে মুখ তুলে বললাম, "মিঃ রায়,যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলতে চাই।"

রায়সাহেব আমার দিকে তাকালেন। "বলুন !"

একটু ইতস্তত করে বললাম, "অনামিকা স্নেন বিয়ের আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন। কোনও মেয়ে ওইভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলে তার আত্মীয়স্বজন চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। পুলিশকে জানাবেন। কাগজে ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হবে। এমন কি, কেউ তাকে এলোপ করেছে বা কিডন্যাপ করেছে বলে সন্দেহ হবে এবং তার নামে পুলিশের কাছে—"

কর্নেল প্রায় একটা অট্টহাসি হেসে আমাকে থামিয়ে দিলেন। "স্ক্যান্ডাল জয়ন্ত, স্ক্যান্ডালকে শিক্ষিত বাঙালি পরিবার যমের মতো ভয় পায়। বিশেষ করে অনামিকাদের মতো পরিবার—মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত যাঁরা। বরং এসব পরিবারকে বাঙালি ভদ্রলোক পরিবার বলাই উচিত। এঁরা বাড়ির মেয়ে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সচরাচর চেপে রাখতেই চান। ব্যতিক্রম থাকতে পারে। সেটা

ধর্তব্য নয়। তার চেয়ে বড় কথা, অনামিকা বিয়ের প্রাক্কালে নিখোঁজ হয়েছিলেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে স্ক্যান্ডালের ভয়টা ছিল সাংঘাতিক।"

আবার ব্রিফকেস খুললেন রায়সাহেব। তারপর ব্যাংকের একটা চেকবই বের করলেন। কর্নেল আস্তে বললেন, "আপনি আবার একটা ভুল করছেন মিঃ রায়!"

রায়সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী ভুল?"

"আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নই। ডিটেকটিভই নই।"

"আপনি আমার এই কেস নিচ্ছেন না?"

"কেস হিসেবে নিচ্ছি না। বড় জোর বলতে পারি, আই অ্যাম ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড।" কর্নেল চোখ বুজে হেলান দিলেন। "আই শুড ট্রাই মাই বেস্ট টু সল্‌ভ্ দা মিস্ট্রি।"

"কিন্তু এতে আপনার সময় লাগবে। পরিশ্রম হবে। এমন কি কোথাও যেতে হলে—কিংবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে টাকাকড়িও খরচ হতে পারে।"

"দ্যাটস্ মাই হবি, মিঃ রায়।"

রায়সাহেবের কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠল। "কিন্তু এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজেই আইনের দিক থেকে আপনার অধিকারের প্রশ্ন ওঠারও তো চান্স আছে। সে জন্য অন্তত একটা লেটার অব অথরিটি দরকার। কিংবা দুজনের সই করা একটা লেটার অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং—"

"দরকার হবে না। আপনি শুধু ওই কাগজগুলো আর আপনার নেমকার্ড রেখে যান।"

ভি রায় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর পকেট থেকে একটা নেমকার্ড বের করে টেবিলে রাখলেন। বললেন, "তা হলে আমি উঠি, কর্নেল সরকার। যখনই দরকার হবে, আমাকে রিং করবেন।"

উনি নমস্কার করে দরজার কাছে গেছেন, কর্নেল বললেন, "একটা কথা মিঃ রায়!"

রায়সাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন।

"আপনি কি অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন?"

"বুঝলাম না।"

"কোনও মানুষের অলৌকিক শক্তি থাকা সম্ভব মনে করেন?"

"কেন এ প্রশ্ন করছেন?"

"আপনার গলার চেনে ওই লকেটটা—"

রায়সাহেব হাসলেন। "তাই বলুন। দু বছর আগে একটা এক্সপোর্ট ডিলে প্রায় ফতুর হয়ে গিয়েছিলাম। তখন এক বন্ধু এটা আমাকে ধারণ করতে দেন। লকেটে একজন সন্ন্যাসীর ছবি আছে। তিনি কে, তা আমি জানি না। তবে এটা ধারণ করার পর পায়ের তলায় মাটি পেয়েছিলাম। সংস্কার বা কুসংস্কার যা-ই বলুন, লকেটটা সব সময় পরে থাকি।"

ভি রায় চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, তুমি ওইরকম একটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লকেট ধারণ করছ না কেন?"

বললাম, "আমি ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না।"

"ডার্লিং! বিশ্বাস করে দেখলে ক্ষতি কী? কত বছর ধরে তুমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার নিছক ক্রাইম রিপোর্টার থেকে গেলে।" কর্নেল হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে থাকলেন। "বরং তুমি কাঁটালিয়াঘাটে চলে যাও। অবধূতজির কাছে গিয়ে সটান লুটিয়ে পড়ো।...হ্যালো! অরিজিৎ?....হ্যাঁ, এসেছিলেন।...হ্যাঁ ডার্লিং, এটা একটা রিয়্যাল মিস্ট্রি। তো শোনো। তোমাদের সেই আর্টিস্ট ভদ্রলোক—কী নাম যেন?...হ্যাঁ, সুমিত গুপ্ত। তাঁর ঠিকানাটা চাই...জাস্ট আ মিনিট। লিখে নিচ্ছি। বলো...."

কর্নেল একটা কাগজে নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে ফোন রেখে দিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "পুলিশের আর্টিস্ট, ব্যাপারটা কী?"

"ছি ছি! এটা তোমার জানা উচিত ছিল, জয়ন্ত!"

"কী মুশকিল! জানি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে বর্ণনা শুনে ক্রিমিন্যালদের ছবি আঁকা হয়। কিন্তু আপনি পুলিশের আর্টিস্টকে কী কাজে লাগাবেন?"

কর্নেল একটা খাম থেকে অনামিকা সেনের সেই ধূসর বিবর্ণ ছবিটা বের করে বললেন, "সুমিতবাবুর সাহায্যে ছবিটি পুনরুদ্ধার করতে চাই। ভদ্রলোক শুধু পোর্ট্রেট আঁকিয়ে নন, একজন দক্ষ ফোটোগ্রাফারও। তা ছাড়া ওঁর অ্যানাটমি-জ্ঞানও অসাধারণ। এক মিনিট। ওঁর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিই।"

আবার টেলিফোন করে কর্নেল সুমিতবাবুর সঙ্গে কথা বললেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। "চলো ডার্লিং! বেরিয়ে পড়া যাক। ফিরে এসে তুমি এখানেই লাঞ্চ খাবে। ষষ্ঠী!"

হাঁক ছেড়ে উনি পোশাক বদলাতে ভেতরে গেলেন।

অনামিকা সেনের অস্পষ্ট এবং রঙছুট সাদা-কালো ছবিটার দিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজছিলাম। পঁচিশ বছর আগে সে নিখোঁজ হয়েছে। এই ছবিটা সেই

সময়কার বলে মনে হয় না। একটি কিশোরীমুখের আদল আঁচ করা যাচ্ছে। তা যদি হয়, তা হলে এখন তাকে দেখলে কী করে চেনা সম্ভব হবে?

আবার, অনামিকা সেন যদি সত্যি খুন হয়ে থাকে, তা হলেই বা এই ছবি কোন কাজে লাগবে? কর্নেলের মাথায় একটা লোক উদ্ভট একটা বাতিক ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। এখন এই নিয়ে কিছুদিন ছুটোছুটি করে বেড়াবেন। আমাকেও ছাড়বেন বলে মনে হচ্ছে না। অতএব সুমিতবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে লাঞ্চটা খেয়েই কাট করব। আপাতত কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকব বরং।

কিন্তু কর্নেল এসে খামগুলো গোছাতে গোছাতে বললেন, "লাঞ্চের পর একটু জিরিয়ে নিয়ে আমরা আরেক জায়গায় যাব, জয়ন্ত! তুমি আজ ক্যাজুয়াল লিভ নিচ্ছ। তার মানে, আপিসে যাচ্ছ না।"

ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।...

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার

চিত্রকর সুমিত গুপ্ত ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখার পর বললেন, "ক্রিমিন্যাল?"

বললাম, "না।"

"তা হলে লুনাটিক।"

"তা-ও না।"

সুমিতবাবু আবার আতস কাচ দিয়ে ছবিটা দেখতে দেখতে বললেন, "কিন্তু মেয়েটির মুখে আমি অস্বাভাবিকতার কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আপনি বলতে পারেন, পুলিশের অর্ডারি ছবি আঁকতে আঁকতে আমার কোনও মানসিক বৈকল্য ঘটে গেছে কি না।" চিত্রকর সকৌতুকে হাসলেন। "জানেন? লোকেরা আজকাল আমার কাছে পোর্ট্রেট আঁকাতে আসে না। আমি নাকি নিরীহ সজ্জন মানুষের মুখেও ক্রিমিন্যালের আদল এনে ফেলি! গত মাসে এক কোটিপতি ব্যবসায়ীর ছেলে তার মরা বাপের ফোটো দেখে অয়েলকালার পোর্ট্রেট আঁকতে ফরমাস করে গেল। বিশ হাজার টাকা দাবি করলাম। তাতেই রাজি। তারপর ব্যাটাচ্ছেলে ছবি নিতে এসে চটে আগুন। বলে, আমার বাবার ছবি না চম্বলের ডাকাতের ছবি এঁকেছেন মশাই? ছবি নিল না। ওই দেখুন ছবিটা। আসলে প্রতিকৃতির মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব রূপ কেউ দেখতে চায় না। সবাই চায় সুন্দর চেহারা। ফোটোর বেলাতেও একই ব্যাপার। ফোটোর চেহারা দেখতে সুন্দর হওয়া চাই। আমার নীতি হল, যা ঠিক যা, তাকে ঠিক তা-ই করতে হবে। কারণ

প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে তার শারীরিক রূপের একটা করে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বলুন বা আইডেন্টিটি বলুন, থাকতে বাধ্য।"

দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে বললাম, "খাঁটি কথা বলেছেন সুমিতবাবু! এই ছবিটা ঠিক যা ছিল, তা-ই আমি চাইছি।"

"চেষ্টা করব। জায়গায় জায়গায় অ্যানাটমি-লাইন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে আউটলাইনটা অনুমান করা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ভালরকমের সাহায্য পাব একটা অক্ষত চোখ থেকে। আর—হ্যাঁ, ঠোঁট দুটোর আদল স্পষ্ট। কপালের ডানদিক, ভুরু, ডান কান—" সুমিতবাবু আমার দিকে ঘুরলেন। "আপনি বললেন বছর পঁচিশ আগে নিখোঁজ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এ-ও বলেছি, ছবিটা তারও আগে তোলা।"

"কত বছর আগে?" বলেই সুমিতবাবু মাথা নাড়লেন। "নাহ্! আমার ওসব জানার প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে ইতিমধ্যেই একটু অসুবিধায় ফেলে দিয়েছেন।"

অবাক হয়ে বললাম, "কেন বলুন তো?"

"এ ধরনের ছবি পুনরুদ্ধারের কোনও আগাম ইনফরমেশন ক্ষতিকর। আমি নিজের অজ্ঞাতসারে কিছু এমোশনাল অনুভূতিতে বায়াস্‌ড্ হয়ে যেতে পারি। থাক, আর কিছু বলবেন না। বললেও আমি শুনব না।" সুমিতবাবু উঠে গেলেন একটা টেবিলের কাছে। অগোছাল স্টুডিওর এক কোণায় টেবিলটা জঞ্জালের মতো দেখাচ্ছে। ছবিটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে বললেন, "পুলিশকেও আমি ঠিক এই কথা বলি। ওঁরা বিরক্ত হন। লোকটা কী করেছে, আমার জানার দরকার নেই। আমার দরকার তার চেহারার মোটামুটি একটা বর্ণনা—অবজেকটিভ ডেসক্রিপশন শুনলি।"

কথাগুলো যুক্তিপূর্ণ। বেশ কয়েকবার এই চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। কিন্তু কখনও ওঁর বাড়িতে আসিনি। আসার দরকার হয়নি। তবে আজ এসে বুঝতে পারলাম, উনি এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ। অনেক বিষয় খুব তলিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন।

জয়ন্ত বারবার আমার দিকে কেমন চোখে তাকাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, সে সুমিতবাবুর কথাবার্তা হাবভাবে খুব মজা পেয়েছে। এবার দেখলাম, তার ঠোঁটের কোণায় বাঁকা হাসি। কিছু বলার জন্য সে ঠোঁট ফাঁক করামাত্র তার দিকে চোখ কটমটিয়ে তাকালাম। অমনি সে গম্ভীর হয়ে সেই ব্যবসায়ীর বাতিল ছবিটা দেখতে মন দিল। ছবিটা সত্যিই চম্বলের ডাকাতের বলে মনে হবে।

সুমিতবাবুর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। রোগা বেঁটে মানুষ। লম্বা নাক। দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। মাথায় লম্বা মেয়েলি চুল। চুলে কলপ মাখেন বলে মনে হল। অবশ্য কারও কারও চুল ষাট পেরিয়েও পাকে না। ওঁর পরনে বেজায় ঢোলা চকরা-বকরা লম্বাটে কুর্তা আর চোঙা জিনস্। দু'হাতে প্রচুর রঙ মেখে আছে। আমার ভয় হচ্ছিল, ছবিটাতে রঙ মেখে না যায়। কিন্তু সে ব্যাপারে উনি সচেতন দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

ছবিটা রেখে হঠাৎ উনি ইজেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইজেলে-আঁটা ক্যানভাসে কয়েকটা এলোমেলো রঙিন রেখা থেকে কিছু অনুমান করা কঠিন। বিমূর্ত চিত্রকলারও চর্চা করেন কি সুমিত গুপ্ত? ঘষঘষ করে সরু ব্রাসে একদলা লাল রঙ বুলিয়ে একটু পিছিয়ে এলেন। তারপর ব্রাসটা রেখে আমাদের কাছে ফিরে এলেন। "কবে চাই বলুন?"

বললাম, "যত শিগগির পারেন।"

"আগামী পরশু বিকেলে আসুন। তবে বলে রাখা দরকার, এ ক্ষেত্রে ওয়াটার-কালারই ভাল হবে। কারণ আপনি নিশ্চয় এ ছবি ঘর সাজানোর জন্য রাখবেন। ধরুন, আট বাই বারো ইঞ্চিই যথেষ্ট। নাকি—"

"নাহ্। ওই যথেষ্ট। কিন্তু কত দিতে হবে বলুন?"

সুমিতবাবু নড়ে বসলেন। "আমার মাথা খারাপ? আপনার মতো বিশ্বখ্যাত মানুষের কাছে টাকা নেব?"

হেসে ফেললাম। "আমাকে বিশ্বখ্যাত করে ফেললেন সুমিতবাবু!"

"নিশ্চয়। লাহিড়িসায়েবের কাছে শুনেছি আপনি ফরেন ম্যাগাজিনে আর্টিকেল লেখেন। বড় বড় ইন্টারন্যাশানাল সেমিনারে আপনার ডাক পড়ে। তা ছাড়া কত সাংঘাতিক সাংঘাতিক ক্রাইম আপনি ফাঁস করেছেন। বাব্বা! কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে একটা ছবি এঁকে দিয়ে আমি টাকা নেব? আমার চৌদ্দপুরুষ ধন্য হয়ে যাবে! এই যে আপনি আমার স্টুডিওতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—"

"প্লিজ সুমিতবাবু!"

সুমিত গুপ্ত হাসলেন। "পরশু পেয়ে যাবেন। বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবেন। আপনাকে কষ্ট করে আর আসতে হবে না। আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।"

ঘড়ি দেখে বললাম, "তা হলে উঠি। আপনার খাওয়ার সময় হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।" একটু রসিকতা না করে পারলাম না। "আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, ওই দরজার পর্দার নীচে সম্ভবত মিসেস গুপ্তের পা দেখেছি।"

সুমিতবাবু চোখ বড় করে বললেন, "এই হল গিয়ে রহস্যভেদীর চোখ ! তবে স্যার, একটু ভুল হয়েছে। আমি আপনার মতোই ব্যাচেলার। যার পা দেখেছেন, সে আমার বোন জয়িতা।"

"সরি সুমিতবাবু !"

সুমিতবাবু গলা চড়িয়ে ডাকলেন, "জয়ি ! একবার এস। একজন ফেমাস ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

যে কাজের ছেলেটি কফি দিয়ে গিয়েছিল, সে পর্দা তুলে বলল, "দিদি বাথরুমে।"

"আচ্ছা। ঠিক আছে।" সুমিতবাবু উঠে গিয়ে আবার ইজেলের ক্যানভাসে একদলা রঙ বুলিয়ে দিলেন।

এবার একটা মুখের আভাস টের পেলাম। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "তা হলে চলি সুমিতবাবু !"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়েছিল। ইজেলের ছবিটার দিকে তার দৃষ্টি। "আচ্ছা সুমিতবাবু, যে ছবিটা আঁকছেন, সেটা কি কোনও ক্রিমিন্যাল কিংবা লুনাটিকের ?" বলে সে আমার দিকে ঘুরে বাঁকা হাসল।

বুঝলাম অনামিকা সম্পর্কে জয়ন্তের ইতিমধ্যে একটা সেন্টিমেন্ট গড়ে উঠেছে। যৌবনের ধর্ম ! সুমিতবাবু অনামিকা সম্পর্কে ক্রিমিন্যাল বা লুনটিক বলায় সে চটে গেছে সম্ভবত।

সুমিতবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁ তর্জনী ঠোঁটে লম্বালম্বি রেখে এবং চোখে হেসে চাপা স্বরে বললেন, "চুপ ! চুপ ! জয়িতার কানে গেলে কেলেংকারি হবে। এটা ওর গুরুদেবের পোর্ট্রেট।" চিত্রকর সামনের দেয়ালে কার্ডবোর্ডে পিন দিয়ে আঁটা একটা ছোট্ট সাদা-কালো ফোটো দেখালেন। "দেখতে পাচ্ছেন তো ? গুরুদেব এই ক্যানভাসে এসে বিশাল হবেন—উইদ অল হিজ গ্রেটনেস অ্যান্ড গড্‌লি গ্র্যাঞ্জার।"

জয়ন্তকে অনেক সময় বাগ মানাতে পারি না। সে বলল, "উনি কাঁটালিয়াঘাটের সেই অবধূত নন তো ?"

সুমিত গুপ্ত আগের মতো চাপা স্বরে এবং চোখে হেসে বললেন, "কাগজের লোক আপনি। ঠিকই ধরেছেন। আর বলবেন না মশাই ! আজকাল এই এক হুজুগ উঠেছে ! লোকে মিরাকলের ভক্ত। আসলে অনিশ্চয়তা, কালচার্যাল শক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুঃখশোকঘটিত চিত্তবিকার—চলুন, নীচে অব্দি এগিয়ে দিই আপনাদের।"

সিঁড়িতে নামতে নামতে সুমিতবাবু বললেন, "মাস ছয়েক আগে আমার ভগ্নীপতি ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। তারপর মেয়েদের যা হয়। আসলে জয়িতা বরাবর একটু কনজারভেটিভ প্রকৃতির। আমার মায়ের স্বভাবটি পুরোপুরি পেয়েছে। বাবা কিন্তু একেবারে উল্টো ছিলেন। আমার মতো খোলামনের মানুষ। সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী। যাই হোক, কর্নেলসায়েব! আগামী পরশু বিকেলে আপনি ছবি পেয়ে যাচ্ছেন।"....

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে জয়ন্ত বলল, "আমরা আজ সকাল থেকে মিরাকলের পাল্লায় পড়েছি, কর্নেল! আমার কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে।"

"সর্বনাশ, ডার্লিং!" আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করে বললাম। "এ অবস্থায় তোমার গাড়ি চালানো উচিত হবে না। বরং আমি ড্রাইভ করি।"

জয়ন্ত হাসল। "না, না। কথাটা সে-অর্থে বলিনি। ব্যাপারটা আপনি ভেবে দেখুন। আজ কাগজে যে গডম্যানের চ্যালেঞ্জ বেরুল, ঘটনাচক্রে এতক্ষণে তাঁর দর্শনও পাওয়া গেল। এদিকে আপনার ক্লায়েন্ট ভি রায়ের গলায় একটা লকেটে কোনও গডম্যানের ছবি ছিল। তিনিও সম্ভবত একই গডম্যান।"

গাড়ি বড়রাস্তায় পৌঁছুলে বললাম, "তুমি ঠিকই ধরেছ, জয়ন্ত! মিঃ রায়ের গলার লকেটের ছবিটা ছোট হলেও আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। ফুট তিনেক দূরত্ব থেকে দেখা একবর্গ ইঞ্চি লকেটের রঙিন ছবি। এ বুড়োবয়সেও আমার দৃষ্টিশক্তি কেমন, তা তুমি বিলক্ষণ জানো।"

"কিন্তু আপনি নিজেই আক্ষেপ করেন, আপনার ভীমরতি ধরেছে। বাহাত্তুরে ধরেছে!"

"হ্যাঁ, তা করি। তো তোমার বক্তব্যটা কী?"

"সুমিতবাবুর স্টুডিওতে ওই ছবিটা আপনার চোখ এড়িয়ে গেল কী করে? নেহাত আমি কথাটা না তুললে—"

ওর কথার ওপর বললাম, "চোখ এড়িয়ে যায়নি। একজন চিত্রকরের ডেরায় নানারকম মানুষ, এমন কি দেবদেবী তো বটেই, কিম্ভূত অদ্ভুত সবরকম বস্তু বা প্রাণীর ছবি থাকা স্বাভাবিক। ভূতপেত্নী, যক্ষ-রক্ষ, পিশাচ-ডাকিনীদেরও দেখা পাওয়া যাবে। কাজেই কাঁটালিয়াঘাটের অবধূতজির ছবি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?"

"ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে আমার।"

"তার মানে তুমি সত্যিই মিরাকলে বিশ্বাস করছ!"

জয়ন্ত একটু ক্ষুব্ধ হল। "কী আশ্চর্য, আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন

না।"

হাসতে হাসতে বললাম, "এতে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই, ডার্লিং। একেক সময় একেকজন গডম্যান খুব হিড়িক ফেলে দেন। তখন অনেকের বাড়িতে তুমি তাঁর ছবি দেখবে। অনেকের লকেটে বা আংটিতেও তাঁর ছবি থাকবে। সম্প্রতি কাঁটালিয়াঘাটের শ্রীশ্রীভূতানন্দ অবধূত মিরাকল্ দেখিয়ে হোক বা যে-ভাবে হোক, একটা বড় রকমের হিড়িক ফেলতে পেরেছেন। কাজেই এখন অনেকের কাছেই তাঁর ছবি দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জয়ন্ত বলল, "সুমিতবাবু অনামিকার ছবিতে কেন একজন ক্রিমিন্যাল কিংবা লুনাটিককে দেখতে পেলেন? আমার এটা খুব খারাপ লেগেছে।"

"ডার্লিং! তুমি রোমান্টিক—"

"কী মুশকিল! আমি আপনার মতামত জানতে চাইছি।"

"মানুষের মুখে কিছু লেখা থাকে না।"

"সুমিতবাবু কিন্তু অনামিকা সেনের ঝাপসা ছবি দেখেই বুঝে গেছেন, কী একটা অস্বাভাবিকতা ছিল।"

"থাকতে পারে। হয়তো উনি অ্যানাটমির কোনও গণ্ডগোলই বোঝাতে চেয়েছেন।"

জয়ন্ত জোর দিয়ে বলল, "ওঁর প্রথম ইম্প্রেসন অ্যানাটমি সংক্রান্ত নয়। চরিত্র সংক্রান্ত।"

কোনও মন্তব্য করলাম না। চোখ বুজে ঘটনাটা সাজানোর চেষ্টা করছিলাম। পঁচিশ বছর আগে অনামিকা সেন নামে একটি মেয়ে বিয়ের আগের দিন নিখোঁজ হয়ে যায়। পঁচিশ বছর পরে তার এক প্রাক্তন প্রেমিক তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা শুনে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল। বিজ্ঞাপনের জবাবে এল হুমকি দেওয়া লাল কালিতে লেখা চিঠি। কিন্তু এর মধ্যে কোথাও যেন একটা তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কী সেটা?

মিঃ রায় অনামিকার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা শুনে কেন এতকাল পরে অমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসলেন?

অনামিকা তাঁর সঙ্গেই পালিয়েছে বলে রটেছিল কি? অনামিকা যে তাঁর সঙ্গে পালায়নি, সেটা প্রমাণ করতেই কি এই তৎপরতা?

কিন্তু কেন? পঁচিশ বছর কম সময় নয়। তা ছাড়া অনামিকার মা বেঁচে নেই। তা হলে কার কাছে জবাবদিহির প্রয়োজন হল? এ-ও গুরুত্বপূর্ণ, সমীর

রুদ্র তাঁকে চিনতে পারা সত্ত্বেও কেন এড়িয়ে গেলেন বৈশম্পায়ন রায় ? সমীরবাবুকে বলতে পারতেন, গুজবটা মিথ্যা।

মিঃ রায়ের দুটি আচরণের ব্যাখ্যা দরকার। এক : কেন কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন ? দুই : কেন সমীর রুদ্রকে এড়িয়ে গেলেন ? প্রথম প্রশ্নের উত্তর যদি হয় 'নিছক কৌতূহল' এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর যদি হয় 'অপছন্দ লোককে এড়িয়ে যাওয়া', তা হলে রহস্যের কেন্দ্র গিয়ে পড়ে লাল কালিতে লেখা হুমকিতে।

এ দিকে মিঃ রায় সন্দেহ করছেন, কেউ অনামিকাকে খুন করতেও পারে। তাই সে চাইছে না কেউ অনামিকা সম্পর্কে তদন্ত করুক। এক্ষেত্রে একটা সিদ্ধান্ত সহজেই করা চলে : অনামিকা তা হলে এমন সময়ের মধ্যে খুন হয়েছে, যাতে এখনও খুনীর বিরুদ্ধে মামলা করা চলে।

কিন্তু যদি অনামিকা বেঁচে থাকে ?

আবার লাল চিঠির হুমকিতে ফিরে আসতে হচ্ছে। কেন এই হুমকি ? মিঃ রায় বলছেন, অনামিকার প্রতি তাঁর নিছক সাময়িক আসক্তি ছিল। কাজেই এই পরিণত বয়সে তিনি অনামিকার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার মানুষ নন।

তা নন। তা হলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন কেন ? 'নিছক কৌতূহল' ! নাকি কিছু গোপন করছেন ? মোট কথা, একটা তথ্যগত গণ্ডগোল থেকেই যাচ্ছে।

"কর্নেল !"

চোখ খুলে দেখলাম, পৌঁছে গেছি। গাড়ি থেকে নেমে বললাম, "তুমি সুমিতবাবুর ফার্স্ট ইম্প্রেসনের কথা বলছিলে জয়ন্ত ! আই এগ্রি। অনামিকার মধ্যে সত্যি একটা অস্বাভাবিকতা ছিল। সেটা খুঁজে বের করতে পারলেই এ রহস্যের সমাধান সম্ভব।"

জয়ন্ত গাড়ি লনের পার্কিং জোনে রেখে এল। তারপর সিঁড়িতে পা রেখে বলল, "খিদের মুখে এখন রহস্য-টহস্য ফালতু হয়ে গেছে, বস ! কবিতায় আছে না ? ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়—"

"অনামিকা সেন যেন ঝলসানো রুটি।"

জয়ন্ত হেসে ফেলল। "সত্যি ! আপনি এ বয়সেও এত রস ধারণ করে আছেন, ভাবা যায় না !"

"ডার্লিং, অবধূতজির মিরাকলের মতো আজ আরও একটি মিরাকল তোমার চোখ এড়িয়ে গেছে।'

"কী বলুন তো ?"

"আমি ব্যাচেলার। মিঃ রায় ব্যাচেলার। সুমিতবাবু ব্যাচেলার।"

"আমাকে হাফ-ব্যাচেলার বলতে পারেন। তবে ফুল ব্যাচেলারের ত্রাহস্পর্শ সত্যি একটা মিরাকল্। এখন দেখা যাক, কী ঘটে।"

ডোরবেলের সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। ষষ্ঠী বলল, "নাহিড়িসায়েব তিনবার ফোং করেছিলেন। বললেন, বাবামশাই ফিরলেই ফোং করতে বলবে। শিগগির ওঁকে ফোং করুন।"

চোখ কটমটিয়ে বললাম, "ফোং করছি। তুই খাবার রেডি কর।"

ষষ্ঠীকে আজ অব্দি কিছুতেই ফোন বলানো গেল না। নাকি ও ইচ্ছে করেই ফোং বলে? আমার এই প্রিয় মধ্যবয়সী পরিচারকটি এত বছরেও শহুরে হয়ে উঠতে পারল না। ল এবং ন-এ সবসময় গণ্ডগোল করে।

টেলিফোনে অরিজিৎকে তখনই পেলাম। বললাম, "এনিথিং রং, ডার্লিং?"

"হাই ওল্ড বস্! সুমিতবাবুর লাইন কি ডেড?"

"জানি না। কেন?"

"আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য বহুক্ষণ চেষ্টা করেও লাইন পেলাম না। এদিকে এক সাংঘাতিক ব্যাপার।"

"বৈশম্পায়ন রায়—"

"নাহ্। সমীর রুদ্র ইজ ডেড। বৈশম্পায়নের কাছে তার নাম শুনে থাকবেন।"

"মাই গড! ডেড, মানে মার্ডার্ড?"

"নাহ্। স্যুইসাইড বলেই মনে হয়েছে। ডান কানের ওপর কপালের ডান দিকে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনেছেন। রিভলভারটা পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের। পাশেই পড়ে ছিল।"

"কোনও স্যুইসাইডাল নোট পাওয়া গেছে?"

"নাহ্। তবে একটা হুইস্কির বোতল আর গ্লাস পাওয়া গেছে। বোতল অর্ধেকের বেশি খালি। মনে হচ্ছে, মাতাল অবস্থায় হঠাৎই ঝোঁকের বশে স্যুইসাইড করেছেন। ওঁর অফিসের কলিগ্‌রা বলছেন, কিছুদিন থেকে হতাশায় ভুগছিলেন। ওঁর বিরুদ্ধে কোম্পানির একটা অ্যালিগেশন ছিল। তদন্ত চলছিল। কাজেই—"

"কিন্তু কোথায় স্যুইসাইড করেছেন ভদ্রলোক?"

"শেক্সপিয়ার সরণিতে ওঁর এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে। তিনি নাকি ওয়াশিংটনে থাকেন। ফ্ল্যাটটা দেখাশোনার জন্য সমীরবাবুকে চাবি দিয়ে গেছেন। গত রাত্রে ওখানেই ছিলেন উনি। দরজায় ইন্টারলকিং সিস্টেম আছে। বাইরে থেকে খোলা

যায় না। সকাল আটটায় নীচের একটা রেস্তোরাঁ থেকে ব্রেকফাস্ট নিয়ে যায় একজন। রাত্রেই বলা ছিল। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট। যাই হোক, সে সাড়া না পেয়ে ফিরে আসে। নাও ইটস্ আ পয়েন্ট, সে ভেতরে ট্যাব থেকে জল পড়ার শব্দ শুনেছিল।"

"মেক ইট ব্রিফ, অরিজিৎ! আমি ক্ষুধার্ত।"

"ওকে বস্! বরং আমি যাচ্ছি।"

"এস। শুধু বলো, হাউ দা বডি ওয়জ ডিস্কভার্ড?"

"সমীরবাবুর মা একটা জরুরি দরকারে ওঁর অফিসে ফোন করেন। তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। উনি অফিস যাননি শুনে ভদ্রমহিলা এই ফ্ল্যাটে চলে আসেন। উনিও জল পড়ার শব্দ শোনেন। তারপর—"

"দ্যাটস এনাফ। তুমি চলে এস। ছাড়ছি।"

ফোন রেখে দেখলাম, জয়ন্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চমকানো গলায় বলল, "মিঃ রায় স্যুইসাইড করেছেন?"

"নাহ্। ওঁর সেই বন্ধু সমীর রুদ্র।" ওর হাত ধরে টানলাম। "ক্ষুধার রাজ্যে এখন পৃথিবী অন্যরকম হয়ে গেছে। দুটো বাজে। তুমি কি স্নান করবে? কী দরকার? আমি সপ্তাহে একদিন স্নান করি। আর শোনো ডার্লিং! খাওয়ার টেবিলে বসে খাদ্য ছাড়া অন্য কোনও আলোচনা চলবে না।"...

তিনটেয় অরিজিৎ এল।

জয়ন্তকে দেখে বলল, "জয়ন্তবাবু যে! গন্ধ পেয়েই ছুটে এসেছেন? তবে এই স্টোরিতে রোমহর্ষক বা রুদ্ধশ্বাস কিছু নেই, সো মাচ আই ক্যান টেল য়ু!"

বললুম, "জয়ন্তকে আজ সকাল থেকে আমিই আটকে রেখেছি।"

অরিজিৎ হাসতে লাগল। "তা হলে আপনার স্নেহবন্ধনে পড়ে ভদ্রলোকের খুব দুর্ভোগ হচ্ছে! ঠিক আছে। দেখুন, অন্তত বৈশম্পায়নের ব্যাপারটা থেকে একটা জমকালো স্টোরি ওঁকে দিতে পারেন নাকি।"

জয়ন্ত বলল, "মিঃ লাহিড়ি! আমার ধারণা, দা স্টোরি অলরেডি ইজ দেয়ার। এখন শুধু একটুখানি লিংক-আপ দরকার। বিটুইন এ অ্যান্ড বি।"

"সর্বনাশ!" অরিজিৎ চোখ বড় করে বলল। "প্রবাদ আছে, আমরা পুলিশেরা নাকি ছাইয়েরও দড়ি তৈরি করতে পারি। সাংবাদিকরা দেখছি আরও এককাঠি সরেস। গন্ধ দিয়েও দড়ি তৈরি করতে পারেন! আপনি সম্ভবত বৈশম্পায়নের সঙ্গে সমীর রুদ্রকে লিংক-আপ করার কথা ভাবছেন? কর্নেল, হোয়াট ডু য়ু থিংক অব ইট?"

চোখ বুজে চুরুট টানছিলাম। বললাম, "একটা লিংক তো আছেই। পঁচিশ বছর পরে মিঃ রায় একটা করে তাঁর এক সময়ের বন্ধু মিঃ রুদ্রের দেখা পান। মিঃ রুদ্র ওঁকে চিনতে পারেন। অ্যান্ড য়ু নো হোয়াট হ্যাপনড্। অনামিকা সেনের এপিসোড এসে যায় স্বভাবত। মিঃ রায় তাঁর বন্ধুকে এড়িয়ে চলে আসেন। তারপর বিজ্ঞাপন, হুমকি দেওয়া লাল চিঠি। তারপর মিঃ রুদ্রের স্যুইসাইড। তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। মিঃ রায় বলছিলেন, অনামিকা রহস্যের ব্যাপারে মিঃ রুদ্রকে ওঁর খুব দরকার হয়ে উঠেছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁকে যোগাযোগ করতে বলবেন।"

অরিজিৎ বলল, "বাসুকে আমি ওর অফিসে কন্ট্যাক্ট করেছিলাম। ও যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছুল, তখন বডি মর্গে পাঠানো হয়ে গেছে। বাসু সমীরবাবুর মাকে নিয়ে কসবায় পৌঁছে দিতে গেছে।"

বললাম, "ওঁর রিঅ্যাকশন কী?"

"ভীষণ আপসেট।"

"মিঃ রুদ্রের স্ত্রী?"

"স্ত্রীর সঙ্গে ক'বছর আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা আবার বিয়ে করেছেন। এখন মাদ্রাজে থাকেন। সমীরবাবুর হ্যাপিলাইফ ছিল না।"

একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, "পাশের ফ্ল্যাটের কেউ গুলির শব্দ শোনেনি?"

"শুনে থাকতে পারে। বলছে না।" অরিজিৎ সিগারেটের প্যাকেট বের করে জয়ন্তকে দিল। নিজে একটা ধরাল। তারপর বলল, "পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে লালবাজারে ও সি হোমিসাইডকে ঘটনাটা জানানো হয়েছিল। কারণ প্রথমে ওটা মার্ডার মনে হয়েছিল। যাই হোক, ওই সময় আমি সি পি-র ঘরে কনফারেন্সে ছিলাম। খবরটা দৈবাৎ পেয়েছিলাম। তবে সমীর রুদ্র নামটা শুনেই আমি ইন্টারেস্টেড হয়েছিলাম। বাসুকে ফোন করে আমি ঘটনাস্থলে গেলাম। ততক্ষণে বডি সরানো হয়ে গেছে। বডির পজিশন—একটা কাগজ দিন। এঁকে দেখাচ্ছি।"

টেবিল থেকে প্যাড দিলাম। অরিজিৎ চমৎকার একটা স্কেচ করল। দেখার পর বললাম, "বডি বাঁ পাশে কাত হয়ে পড়েছিল?"

"ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের বর্ণনা। শোবার ঘরের মেঝেয় কার্পেটের ওপর বাঁ পাশে কাত হয়ে—"

"বাঁ পাশে?"

অরিজিৎ তাকাল। "এনিথিং রং ?"

"নাহ্। রিভলভারটা দেখছি ডান হাতের বুড়ো আঙুলের কাছে!"

"ফোটো তোলা হয়েছে। এক কপি প্রিন্ট পেয়ে যাবেন—ইফ য়ু আর ইন্টারেস্টেড!"

"হ্যাঁ। তো রিভলভারটা ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে ?"

"অবশ্যই। আঙুলের ছাপ কালকের মধ্যেই পাওয়া যাবে। গুলিটা ওই রিভলভারের কি না, সেটাও দেখা দরকার। ছটা গুলির মধ্যে পাঁচটা আছে।"

"জল পড়ার ব্যাপারটা কী ?"

"ডাইনিংয়ের বেসিন খোলা ছিল।"

"হুইস্কির বোতল আর গ্লাস কোথায় ছিল ?"

"সরি। এঁকে দেখাচ্ছি।"

"থাক। মুখে বলো। পরে ফোটোতে দেখে নেব।"

"শোবার ঘরেরই একটা গোল নিচু টেবিলে। টেবিলের তিনদিকে তিনটে কুশন। বডি থেকে জাস্ট দেড়-দু মিটার দূরে।"

"অ্যাশট্রে ছিল টেবিলে ?"

অরিজিৎ হাসল। "অবশ্যই ছিল এবং একটা চারমিনারের প্যাকেটও ছিল। একটা লাইটার ছিল। প্যাকেটে একটামাত্র সিগারেট ছিল। অ্যাশট্রেতে অন্য ব্র্যান্ডের সিগারেটের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আর কিছু ?"

"ঘর থেকে শুধু বডি আর রিভলভার ছাড়া আর কিছু নিয়ে যাওয়া হয়নি ?"

"নাহ্। আমাদের অফিসাররা অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। তাঁরা কনভিন্সড্ যে এটা স্যুইসাইড কেস।"

একটু হেসে বললাম, "কিন্তু তুমি কি কনভিন্সড্ ?"

অরিজিৎ আস্তে বলল, "না হওয়ার কী আছে ?"

"ডার্লিং। তুমি আমাকে তিনবার রিং করেছিলে। তারপর তুমি ছুটে এসেছ। তুমি নিজের উৎসাহেই এসেছ। তোমার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ করছি। হোয়াই ইট ইজ, অরিজিৎ ? তুমি সিগারেটটাও এত শিগগির শেষ করে ফেললে!"

অরিজিৎ শুকনো হেসে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। "মে বি—বাসু আমার পুরনো বন্ধু এবং ওর এক পুরনো প্রেমিকার ব্যাপারটা আমাকে হ্যন্ট করছে। এমনও হতে পারে, জয়ন্তবাবুর মতো আমিও নিজের অজ্ঞাতসারে একটা লিংক-আপ করে ফেলেছি। তবে সেটা বাসুর সঙ্গে নয়, অন্যকিছুর সঙ্গে।

কিন্তু সেই অন্যকিছুটা এখনও আমার কাছেই স্পষ্ট নয়।"

"দেখ অরিজিৎ! অনেকসময় আমরা জানি না যে, আমরা কী জানি!"

অরিজিৎ একটু চুপ করে থাকার পর বলল, "বেসিন থেকে জল পড়ার ব্যাপারটাতে আমার একটা খটকা লেগেছে। একটা সহজ ব্যাখ্যা আমাকে দেওয়া হয়েছে : মাতাল সমীরবাবু বেসিন বন্ধ করেননি। এ দিকে ডাক্তারের মতে, সমীরবাবুর মৃত্যু হয়েছে রাত দশটা থেকে বারোটার মধ্যে। কারণ বডির রাইগর মর্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার মানে, প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে বেসিনে জল পড়া উচিত।"

জয়ন্ত বলল, "পড়তেই পারে।"

অরিজিৎ বলল, "ওই ফ্ল্যাটের ডাইনিং রুমের সংলগ্ন মিসেস কাপাড়িয়ার ফ্ল্যাট। ভদ্রমহিলা জোর গলায় বলছিলেন, ভোর ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে কোনও একসময় উনি জলপড়ার শব্দ শুনতে পান। রাত্রে তেমন কোনও শব্দ তিনি নাকি শোনেননি। ওঁর স্বামী বললেন, শি ইজ আ মেন্টাল পেশ্যান্ট। আমি ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি গুলির শব্দ শুনেছিলেন নাকি? উনি বললেন, নাহ্। দুপুর রাত্রি অব্দি নীচের রাস্তায় প্রচণ্ড গাড়ির শব্দ হয়। বিশেষ করে কয়েকটি মোটরসাইকেল আছে ওই বাড়িরই যুবকদের। তারা নাকি ইচ্ছে করেই যখন-তখন আওয়াজ দেয়। ফ্ল্যাটটা দোতলায়। কাজেই গুলির শব্দ মোটরসাইকেলের ব্যাকফায়ারের সঙ্গে মিশে যেতেই পারে। কিন্তু মিসেস কাপাডিয়ার জলপড়ার শব্দ শোনাটা সন্দেহজনক। হ্যাঁ, মেন্টাল পেশ্যান্ট উনি। ওঁর স্বামী রিটায়ার্ড ডক অফিসার। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখালেন আমাকে। ওঁর স্ত্রী ততক্ষণে হিস্টেরিক হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে, তখন ব্যাপারটাকে আর গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু—"

অরিজিৎ হঠাৎ চুপ করল। বললাম, "মেন্টাল পেশ্যান্ট হলেই যে মিথ্যা বলবেন, তার মানে নেই। তবে মেন্টাল পেশ্যান্টদের সমস্যা হল, ওঁদের কাছে রিয়্যাল-আনরিয়্যাল একাকার হয়ে যায়। মানসিক দিক থেকে সুস্থদের কাছে যা অবাস্তব, মানসিক রোগীদের কাছে তা বাস্তব। নাহ্—সমসময় নয়, অন্তত কোনও-কোনও সময়। কাজেই জলপড়ার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।"

জয়ন্ত বলল, "মিঃ রায় কিন্তু এখনও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না, কর্নেল!"

অরিজিৎ বলল, "হি ইজ আপসেট। পরে করবেন নিশ্চয়।"

জয়ন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। "ভুলে যাবেন না, একটা বারে সমীর রুদ্রের সঙ্গে রায়সায়েবের হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার পর থেকেই এই ড্রামার শুরু। কর্নেল, বলুন তা-ই কি না?"

বললাম, "তুমি ড্রামা বলছ?"

"নিশ্চয় ড্রামা। রায়সায়েব সমীরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন মনে হচ্ছিল কি না বলুন? কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার কথাও বলছিলেন। মনে করে দেখুন।"

"হুঁ।" সায় দিয়ে বললাম। তোমার কথায় যুক্তি আছে।"

"হুমকি দেওয়া চিঠির পর রায়সেয়েবের সমীরবাবুকে দরকার হল। কেন হল, এটা একটা পয়েন্ট।"

অরিজিৎ বলল, "আজ সকালে বাসু আমার ঠিকানা যোগাড় করে আমার কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা করে। সবটা শোনার পর আমিও ওকে এই প্রশ্নটা করেছিলাম। ও বলল, অনামিকা কীভাবে নিখোঁজ হয়েছিল এবং তারপর কী কী ঘটেছিল, ও জানতে চায়। সেইসঙ্গে লালচিঠির হুমকি সম্পর্কেও সমীরবাবুর সঙ্গে বাসুর আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল। ওর ধারণা, সমীর ওকে সাহায্য করতে পারবে। কোনও ইনফরমেশনও দিতে পারবে। কাজেই এ পয়েন্টটাতে কোনও গণ্ডগোল আমি অন্তত দেখছি না জয়ন্তবাবু!"

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। ধরাতে যাচ্ছি, ষষ্ঠী কফি আনল। সে 'লালবাজারের নাহিড়িসায়েব'-কে স্যালুট ঠুকতে ভুলল না। অনেক ছোটখাটো ব্যাপার আমাকে অবাক করে। ষষ্ঠী এমন চমৎকার স্যালুট ঠোকা কোথায় শিখল? চারটে বাজে। ওকে বললাম, "ছাদে যা শিগগির। দেখবি কয়েকটা টব ঢাকা দেওয়া আছে। খুলে দিয়ে আয়।"

ষষ্ঠী চলে গেলে অরিজিৎ বলল, "আপনার শূন্যোদ্যানের খবর কী?"

"মোটামুটি ভাল।"

"মোটামুটি কেন?"

"নাইজেরিয়ান অক্টোপাস প্ল্যান্টটা এখনও কলকাতার ক্লাইমেটের ধকল সামলাতে পারছে না।"

অরিজিৎ এবং জয়ন্ত খুব হাসতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কফি খাওয়ার পর অরিজিৎ বলল, "আমার একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ, কর্নেল! শেকসপিয়ার সরণির ওই ফ্ল্যাটটা আপনি গিয়ে একবার দেখুন। বহু কেসে অফিসিয়ালি আপনার সাহায্য পুলিশ নিয়েছে। কিন্তু এটা আন্‌অফিসিয়ালি।

কারণ বাসু আমার পুরনো বন্ধু।"

"আচ্ছা অরিজিৎ! রিভলভারটার কি লাইসেন্স আছে? থাকলে কার নামে আছে?"

"সুইডিশ রিভলভার। সমীর রুদ্রকে কখনও কোনও ফায়ারআর্মসের লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। কাজেই ওটা বেআইনি এবং চোরাচালানি জিনিস।"

"ফ্ল্যাটের চাবি পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ। বালিশের তলায় ছিল। তবে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। ফ্ল্যাটের ওনারের শুধু ফার্নিচার ছাড়া কোনও কাগজপত্র নেই। সমীরবাবুরও নেই। তন্নতন্ন খোঁজা হয়েছে। আগেই বলেছি, সমীরবাবু মাঝেমাঝে গিয়ে থাকতেন। ও-বাড়ির লোকেরা ওঁর সঙ্গে কখনও কোনও লোককে দেখেননি। একা যেতেন এবং একা থাকতেন। কাজেই কেসটি স্যুইসাইড।"

"কিন্তু তোমার মনে প্রশ্ন জেগেছে কেন?"

"বেসিনে জল পড়ার ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকে গেছে।" অরিজিৎ হাসল। "মাথার ভেতর জলের শব্দ—"

অরিজিতের কথার ওপর বললাম, "চলো, বেরুনো যাক।"...

জয়ন্ত চৌধুরি

অরিজিৎ লাহিড়ি ফ্ল্যাটটার চাবি নিয়ে গিয়েছিলেন। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিলেন। প্রথমে বসার ঘর। তারপর কিচেন এবং ডাইনিং। তার লাগোয়া বেডরুম। নেহাত দু'ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাট। কর্নেল ডাইনিংয়ে ঢুকলেন। অরিজিৎ বললেন, "আগে বেডরুমটা দেখে নিলে ভাল হত।"

কর্নেল হাসলেন। "তোমার মাথার ভেতর জল পড়ার শব্দ। কাজেই আগে বেসিনটা দেখে নিই।"

বেসিনটার কাছে গিয়ে তিনি ট্যাব খুলে দিলেন। খুব জোরে জল পড়তে থাকল। জলের শব্দটা অদ্ভুত মনে হল আমার। জল কি কোনও কথা বলছে? কর্নেল যেন সেই কথা শুনছিলেন। কাছে গিয়ে বললাম, "কী বুঝছেন? জল কি কিছু বলছে?"

কর্নেল আমার রসিকতা গ্রাহ্য করলেন না। গম্ভীরমুখে বললেন, "এই দেয়ালের ওধারে একজন মানসিক রোগী থাকলে শব্দটা তার পক্ষে অসহ্য হতেই পারে। হয়েছেও বটে। অরিজিৎ! তুমি কী বলতে চেয়েছ, বুঝতে পারছি।"

অরিজিৎ একটু অবাক হয়ে বললেন, "আমি কিছু বলতে চেয়েছি কি না আমি

এখনও নিজেই জানি না, কর্নেল !"

কর্নেল বললেন, "ডার্লিং ! তোমাকে বলেছি, আমরা নিজেরাই জানি না যে আমরা কী জানি !"

"একটু খুলে বললে বুঝতে পারব।"

কর্নেল ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। "কেউ চেয়েছিল মিসেস কাপাড়িয়া উত্তেজিত হয়ে হইচই বাধান এবং বেসিন বন্ধ করতে বলুন। তার মানে, সে চেয়েছিল সমীরবাবুর ডেডবডির কথা জানাজানি হোক। এবং সে জানে, মিসেস কাপাড়িয়া মানসিক রোগী।"

অরিজিৎ আস্তে বললেন, "ঠিক এভাবে কথাটা না ভাবলেও এ ধরনের একটা প্রশ্ন আমার মাথায় ছিল। সম্ভবত কেউ ভোরের দিকে এই ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল।"

বললাম, "সে কী করে ঢুকবে ? চাবি ছাড়া—"

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, "ঠিক বলেছ জয়ন্ত ! চাবি যদি সমীরবাবুর কাছেই থাকে, কেউ বাইরে থেকে কী করে ফ্ল্যাটে ঢুকবে ? অরিজিৎ ! এ ক্ষেত্রে একটা ডুপ্লিকেট চাবি এবং কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব এসে পড়ছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে, প্রতিবেশিনী মিসেস কাপাড়িয়া মানসিক রোগী। এবার প্রশ্ন হল, কে সে ? কেনই বা সে ভোর ছটায় এই ফ্ল্যাটে ঢুকতে এল ? কী কাজ ছিল তার ? ধরে নিচ্ছি, পুলিশের পাল্লায় পড়ার ভয়ে সে নিজে ঘটনাটা জানানোর ঝুঁকি নেয়নি। তাছাড়া তার ফ্ল্যাটে ঢোকা নিয়েও প্রশ্ন উঠত। কিন্তু একটা কাজ তো সে সহজেই করতে পারত। বেরিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করে সমীরবাবুর আত্মহত্যার ঘটনা জানাজানি হওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, সে চুপিচুপি এসে ঢুকেছিল। বেসিন খুলে দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে গিয়েছিল।"

কর্নেল বেডরুমে ঢুকলেন। বেডরুমটা বেশ বড়। অরিজিৎ আলো জ্বেলে তিনটে জানালাই খুলে দিলেন। জানালায় পুরু নস্যিরঙের পর্দা। গোল নিচু টেবিলে হুইস্কির বোতল, একটা গ্লাস, একটা সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার দেখতে পেলাম। কর্নেল হুইস্কির বোতলটা তুলে নিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর বললেন, "জনি ওয়াকার কোম্পানির স্কচ। এয়ারপোর্টের ডিউটি ফ্রি শপ থেকে সদ্য কেনা হয়েছে।"

অরিজিৎ দ্রুত বললেন, "আমরা লক্ষ করেছি। এতে কোনও অস্বাভাবিকতা আছে বলে মনে হয়নি। সম্ভবত সমীরবাবুর কোনও বন্ধু বিদেশ থেকে ফেরার সময় এটা এয়ারপোর্টে কিনেছেন এবং উপহার দিয়েছেন। কিংবা সমীরবাবু

কোনও পরিচিত লোকের কাছে কিনে নিতেও পারেন।"

কর্নেল ঘরের ভেতরটা চোখ বুলিয়ে দেখার পর একটা জানালার কাছে গেলেন। উঁকি মেরে কিছু দেখে সরে এলেন। মেঝের কার্পেটে শুকনো একটু রক্তের ছোপের দিকে অরিজিৎ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কর্নেল শুধু বললেন, "হুঁ!"

অরিজিৎ বললেন, "বডির পজিশন ফোটোতে দেখলে বুঝতে পারবেন। তবে সরেজমিনে দেখানো যাক। এখানটায় বাঁপাশে কাত হয়ে—"

কর্নেল হাত তুলে বললেন, "সে তো বলেছ। কিন্তু অরিজিৎ, আমার মাথার ভেতরও বেসিনে জলপড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি!"

কর্নেলের মুখে কোনও কৌতুকের ছাপ দেখলাম না। অরিজিৎ হাসতে হাসতে বললেন, "হ্যাঁ, দ্যাটস্ দা পয়েন্ট।"

বললাম, "সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি সমীরবাবুর আত্মহত্যার ঘটনা জানাজানি হওয়ার জন্য বেসিন খুলে দিয়ে থাকে, তার উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হয়নি। সমীরবাবুর মা আসার পর জানাজানি হয়েছে। এটা কি কোনও পয়েন্ট নয়?"

অরিজিৎ বললেন, "মিসেস কাপাড়িয়া কোনওকিছুতে হইচই শুরু করলে তাঁর স্বামী তাঁকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেন। এটা আসুরিক চিকিৎসা বলতে পারেন জয়ন্তবাবু! কিন্তু এ ছাড়া ভদ্রলোকের তো আর কিছু করার নেই।"

কর্নেল আবার হুইস্কির বোতলটার কাছে গেলেন। "অরিজিৎ, সমীরবাবু নিশ্চয় স্কচ খাননি। কোথাও সোডাওয়াটারের বোতল দেখলাম না। জলের বোতলও না। ডাইনিং টেবিলেও জলের জগ নেই।" বলে তিনি দাড়ি মুঠো করে ধরলেন। আপনমনে বিড়বিড় করলেন, "র হুইস্কি? কেন? অন্তত একটা জলের গ্লাসও থাকা দরকার ছিল! নেই। কেন নেই?"

অরিজিৎ তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "আমাদের অফিসারদের থিওরি হল, এই গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে সমীরবাবু বেসিনে গিয়ে জল মিশিয়েছেন।"

আমি বললাম, "ফ্রিজের ভেতর জলের বোতল ঢুকিয়ে রেখে এসে স্যুইসাইড করতে পারেন। ফ্রিজ দেখা উচিত ছিল।"

অরিজিৎ একটু হেসে বললেন, "ফ্ল্যাটে কোনও ফ্রিজ নেই। ওনার প্রশান্ত সান্যাল কোনও কারণে এখনও ফ্রিজ কেনেননি। অনুমান করা চলে, পরে কিনবেন—যখন এসে পাকাপাকিভাবে থাকবেন। ফ্ল্যাটের ভেতরটা খুঁটিয়ে লক্ষ করুন জয়ন্তবাবু! বহু দরকারি আসবাব কিংবা গেরস্থালির সরঞ্জাম নেই।"

এতক্ষণে সেটা আমার চোখে পড়ল। কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন,

"জয়ন্তকে আমি বরাবর বলি, দক্ষ রিপোর্টারের থাকা চাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর প্রচণ্ড কৌতূহল। সাংবাদিকের পেশা নিছক কলম-বাজির নয়, আ রিয়্যাল জার্নালিস্ট ইজ আ রিয়্যাল অবজার্ভার! জয়ন্তের ব্যাপারটা যাকে বলে ক্রিয়েটিভ জার্নালিজম। তাই না জয়ন্ত? দশ পার্সেন্ট দুধে নব্বুই পার্সেন্ট জল মেশানো। হুঁ—জল!"

আমাকে তর্কের সুযোগ না দিয়ে কর্নেল ডাইনিংয়ে ঢুকে গেলেন। আবার বললেন, "জল একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। তবে মরুভূমিতে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় জলের মরীচিকা দেখা যায়। আমরা জলকে সেভাবেই দেখছি কি না জানি না। অরিজিৎ! ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখ। হুইস্কির তিনভাগের একভাগ মাত্র পান করা হয়েছে। প্রতিবার হুইস্কি ঢেলে সমীরবাবু বেসিনে এসে জল মিশিয়েছেন—দ্যাটস ইওর অফিসার্স ভার্সন। কিন্তু মদ্যপানে অভ্যস্ত কোনও লোক এই ঝক্কি পোহাবে কেন? ওই দেখ, কিচেনের ভেতর দেয়াল আলমারিতে জলের জগ, দুটো গ্লাস—আরও দেখ, তিনটে ছোট-বড় দিশি হুইস্কির খালি বোতল আছে।"

কর্নেল গ্লাসদুটো নামিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপর মদের বোতলগুলোও খুঁটিয়ে দেখলেন। বারবার শুঁকলেন। তারপর মাথা নেড়ে সরে এলেন। বললেন, "ছিটেফোঁটা জলের চিহ্নও নেই। গত রাতে এগুলোতে জল ব্যবহার করা হলে তার চিহ্ন এখনও থাকত। অক্টোবরে আবহাওয়া শুকনো নয়। গ্রীষ্মকাল হলে বরং কথা ছিল।"

অরিজিৎ বললেন, "তা হলে অফিসার্স ভার্সনিই ঠিক।"

"নাহ্।" কর্নেল মাথা নাড়লেন। "বলেছি, মদ্যপানে অভ্যস্ত লোকের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক। বিশেষ করে বিদেশী মদ বা বিখ্যাত স্কচের ক্ষেত্রে সমীরবাবুর মতো লোকেরা প্রায় একটা রিচ্যুয়াল পালন করবেন তাতে সন্দেহ নেই। ঘনিষ্ঠ কাউকে তো ডাকবেনই। কলোনিয়াল হ্যাং-ওভারের জের, ডার্লিং! জনি ওয়াকার স্কচ বলে কথা!"

"কিন্তু যে স্যুইসাইড করবে, সে—"

"অরিজিৎ! তোমাদের থিওরি, মদ্যপানের পর মাতাল অবস্থায় হঠাৎ ঝোঁকের মুখে সমীরবাবু স্যুইসাইড করে ফেলেছেন!"

অরিজিৎ আস্তে বললেন, "দ্যাট্স্ রাইট। কিন্তু আপনার থিওরি কী দাঁড়াল তা হলে?"

"ওই মদের বোতল আর গ্লাসের সঙ্গে সমীরবাবুর সম্পর্ক নেই। সিগারেট

আর লাইটারের সম্পর্ক থকতে পারে।"

"হো-য়া-ট ?"

"আমার ভুল হতেই পারে। তবে দোজ টু থিংস্ আর পসিব্‌লি প্ল্যান্টেড; সমীরবাবুকে গুলি করে মারার পর—"

অরিজিৎ দ্রুত বললেন, "মার্ডার ?"

"আমার তাই মনে হচ্ছে।" কর্নেল এতক্ষণে চুরুট ধরালেন। "বিশেষ করে বডি বাঁপাশে কাত হয়ে পড়ার ব্যাপারটাও গুরুত্বপূর্ণ। নিজের ডানকানের ওপর নিজে গুলি চালালে সমীরবাবুর বডি ডানপাশেই পড়ার চান্স ছিল। অন্য কেউ গুলি করলে তবেই বাঁপাশে বডি কাত হয়ে পড়তে পারে। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলির ধাক্কায় বডি বাঁপাশেই কাত হয়ে পড়বে। তাছাড়া যে গুলি করছে, সে চায় না ভিকটিমের বডি তার ওপর পড়ুক। সে রিভলভারের নল মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করলে চাপও দেবে—এটা তার সহজাত বোধের প্রক্রিয়া।"

আমি বললাম, "আপনি বলছেন স্কচের বোতল আর গ্লাসটা খুনীই সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু পোস্টমর্টেমে সমীরবাবুর পেটে যদি মদ পাওয়া যায় ?"

কর্নেল হাসলেন। "পাওয়া যেতেই পারে। তবে তা জনি ওয়াকার স্কচ কি না পরীক্ষার উপায় এখনও উদ্ভাবিত হয়নি জয়ন্ত! বিশুদ্ধ অ্যালকোহলের কোনও দেশ-বিদেশ নেই। যে-কোনও খাদ্য-পানীয় পাকস্থলীতে গেলেই জাত খুইয়ে বসে। তুমি মার্কিন কপি খেয়েছ না ধাপার কপি খেয়েছ, পাকস্থলী তার প্রমাণ লোপ করে। বিশেষ করে বারোঘণ্টা পরে তো কপি আর কপিই থাকে না। সমীরবাবুর পাকস্থলীর বিলিতি অ্যালকোহল বারো ঘণ্টা পরে পেডিগ্রি খোয়াতে বাধ্য। তবে আমার মতে, ওঁর পাকস্থলীতে বিলিতি অ্যালকোহল ঢোকেনি।"

কর্নেল বসার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। অরিজিৎ বেডরুমের জানালা বন্ধ করতে গেলেন। আমি বললাম, "তা হলে বোতল আর গ্লাসে খুনীর হাতের ছাপ থেকে গেছে।"

কর্নেল বললেন, "খুনী অত বোকা নয়। তা ছাড়া পুলিশ অফিসাররা ও দুটো জিনিস নাড়াচাড়া করেছেন। আমিও করলাম। তবে রিভলভারে সমীরবাবুর আঙুলের চাপ যাতে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা খুনী করে রেখেছে। সিওর।"

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে দেখি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন পাশের ফ্ল্যাটের দরজায়। অরিজিৎ তাঁকে চড়া গলায় ইংরেজিতে সম্ভাষণ করলেন, "হ্যালো মিঃ কাপাড়িয়া! আপনার মিসেস কেমন আছেন ?"

মিঃ কাপাড়িয়া করুণ হাসলেন। "সারাদিন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।"

অরিজিৎ কর্নেলক বললেন, "ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন নাকি ?"

কর্নেল বললেন, "উনি কানে কম শোনেন ."

অরিজিৎ হেসে ফেললেন। "তবে চোখে ভালই দেখেন।"

কর্নেল মিঃ কাপাড়িয়ার উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বললেন, "আপনি কি মর্নিংওয়াক করেন মিঃ কাপাড়িয়া ?"

কাপাড়িয়া সায়েব সন্দিগ্ধভাবে অরিজিতের দিকে তাকালেন। অরিজিৎ বললেন, "উনি সি বি আই অফিসার।"

কাপাড়িয়াসায়েব একটু হাসলেন। "তা হলে যা ভেবেছিলাম, তা ঠিক।"

কর্নেল বললেন, "কী ভেবেছিলেন ?"

"এ ফ্ল্যাটে সমীরবাবুর আনাগোনা আমার কাছে সন্দেহজনক ঠেকত।"

"কেন ?"

কাপাড়িয়াসায়েব একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "জানি না। তবে আমার মনে হত লোকটা ভাল না। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কেমন যেন একটা—"

"কাল ভোরে আপনি কখন মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন ?"

"পাঁচটায়। ময়দানে ভিক্টোরিয়ার সামনে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করি। সাড়েছটায় ফিরি।"

"কালরাত্রে কখন আপনি শুয়ে পড়েছিলেন ?"

"সাড়ে নটায়। আমি রাত্রিজাগা পছন্দ করি না।"

"কাল সন্ধ্যায় বা তারপরে আপনার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল ?"

"না, না। কেন ?"

"নিছক একটা প্রশ্ন, মিঃ কাপাড়িয়া !" বলে কর্নেল সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। কাপাড়িয়াসায়েব তখনই ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

ফুটপাতে পৌঁছে বললাম, "দারোয়ানকে কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, কর্নেল !"

অরিজিৎ বললেন, "অফিসাররা ওকে অনেক জেরা করেছেন। বিশেষ কিছু জানা যায়নি। এ বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত লোকেরা যাতায়াত করে। চারতলায় বারোটা ফ্ল্যাট। দারোয়ানের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়, কতজন লোক যাতায়াত করেছে। তবে সে গেট বন্ধ করে রাত বারোটায়। খুলে দেয় ভোর পাঁচটায়।"

"গতরাতে সমীরবাবু একা গিয়েছিলেন কি না—"

"একা।" অরিজিৎ হাসলেন। "তবে আড়াইশো টাকা মাইনের দারোয়ানের

কাছে ততবেশি দারোয়ানি আশা করা ঠিক নয়, জয়ন্তবাবু !"

কর্নেল বললেন, "জয়ন্তকে বহুবার বলেছি, হালদারমশাইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যাও। গোয়েন্দাগিরি বলতে কী বোঝায়, হাড়ে-হাড়ে ট্রেনিং পেয়ে যাবে।"

চটে গিয়ে বললাম, "কী আশ্চর্য ! আমি গোয়েন্দাগিরি করতে যাব কোন দুঃখে ? আপনি জোর করে আটকে রেখেছেন এবং টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাই থার্ড পার্সন হিসেবে কিছু প্রশ্ন তুলছি মাত্র। ঠিক আছে, মুখ বুজে রইলাম। কোনও সাংঘাতিক পয়েন্ট মাথায় এলেও চেপে যাব।"

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রাখলেন। "ডার্লিং ! এ বৃদ্ধের ওপর রাগ করার অর্থ হয় না। শোনো, তুমি যে সব প্রশ্ন তুলছ, তা কোনও ক্রাইম ডিটেকশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল্যবান প্রশ্ন। কাজেই আমি চাই, তুমি প্রশ্ন তুলবে। কিন্তু যদি দেখ যে আমি তোমার প্রশ্নে কোনও সাড়া দিচ্ছি না, তা হলে জেনো, সেই প্রশ্নের জবাব আমার জানা। কিংবা জানা না হলেও একই প্রশ্ন আমার মনেও রয়ে গেছে।"

অরিজিৎ লাহিড়ি তাঁর জিপের দিকে পা বাড়িয়ে সকৌতুকে বললেন, "জয়ন্তবাবু ! কর্নেল মাঝেমাঝে আমাকে নিয়েও একই জোক করে থাকেন। থিংক্ ইট ! আমি ডিটেকটিভ ডিপার্টের লোক এবং পুলিশমহলে কিছু সুনাম আছে। অথচ আমাকেও হাস্যাস্পদ করে ছাড়েন। পরে বুঝতে পারি হি ইজ কারেক্ট। আমিই ভুল করেছি।"...

রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম। কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে যখন ফিরলাম, তখন সাতটা বেজে গেছে। ষষ্ঠী জানাল, একটু আগে রায়সাহেব এসেছিলেন। বলে গেছেন, 'ফোং করব।' কর্নেল চোখ কটমটিয়ে হাঁকলেন। "কফি ?" ষষ্ঠী বেজার মুখে চলে গেল।

অরিজিৎ বললেন, "কফি খেয়েই সোজা বাড়ি ফিরব। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।"

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। চোখ বন্ধ। বললেন, "তোমার মাথার ভেতর বেসিনটা আশা করি বন্ধ হয়েছে !"

"হয়েছে। তবে—"

"তবে তুমি কফি খাবার জন্য আমার ঘরে আসোনি অরিজিৎ;তোমার মনে একটা প্রশ্ন উঠেছে। কেন খুনী চেয়েছিল শিগগির সমীরবাবুর স্যুইসাইডের ঘটনা জানাজানি হোক ? তাই না ?"

"আপনি নাকি অন্তর্যামী। অন্তত এ ধরনের একটা প্রবাদ চালু আছে পুলিশ

মহলে। আই এগ্রি।"

আমি না বলে থাকতে পারলাম না, "আজ ভোরে যে ওই ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল—মানে, যাকে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলা হচ্ছে, সে-ই যে খুনী তার প্রমাণ কী?"

কর্নেল চোখ বন্ধ রেখেই দাড়ি নেড়ে বললেন, "রাইট জয়ন্ত! সঙ্গত প্রশ্ন। হুঁ, প্রমাণ আমার হাতে নেই। কিন্তু একটা থিওরি আছে। আর সেই থিওরি ধরে এগোলে একটা ব্যাখ্যা মেলে। ধরা যাক, খুনীর নাম এক্স। এক্স গতরাতে ওই ফ্ল্যাটে যায়। সে সমীরবাবুর চেনা লোক এবং সে এ-ও জানে, পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস কাপাড়িয়া মানসিক রোগী। ওঁর স্বামী কানে কম শোনেন, সকাল-সকাল শুয়ে পড়েন এবং সকাল-সকাল উঠে মর্নিংওয়াকে যান— এ সমস্তকিছুই সে জানে। বাড়িটা 'এল' প্যাটার্ন। দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাট সিঁড়ির অন্যপাশে। চার এবং পাঁচ পাশাপাশি। চারে থাকেন কাপাড়িয়ারা। পাঁচে গতরাতে সমীর রুদ্র ছিলেন। এক্স সমীরবাবুকে গুলি করে মেরে ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে চলে যায়। কেন চাবি নিয়ে যায় এর জবাব হতে পারে : খুনটা আত্মহত্যা সাব্যস্ত করার একটা উপায় হঠাৎ তার মাথায় এসেছিল। হ্যাঁ, মদের বোতল আর গ্লাস টেবিলে রাখার কথাই সে ভেবেছিল। গ্লাস কিচেনে পাওয়া যাবে। কিন্তু অতরাতে মদ খুঁজে পাওয়ার সমস্যা আছে। সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে তখন। যদি বা পাওয়া যায়, যোগাড় করে আনতে গেটে তালা পড়ে যাবে। কাজেই তাকে নিজের স্কচের বোতল নিয়ে ভোরবেলা ওই ফ্ল্যাটে যেতে হয়েছিল।"

অরিজিৎ বললেন, "এবার আমার প্রশ্নটা!"

"এক্স চেয়েছিল ঘটনাটা শিগগির জানাজানি হোক। কেন? এই তো তোমার প্রশ্ন?"

"হ্যাঁ।"

"কসবায় সমীরবাবুর ফ্ল্যাটে তাঁর মা ছাড়া আর কে থাকেন?"

"আর কেউ না।"

কর্নেল চোখ তুলে সোজা হয়ে বসলেন। "এক্স চেয়েছিল, সমীরবাবুর মা খবর পেয়েই ছুটে আসবেন এবং সে সেই সুযোগে কসবার ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকতে পারবে। ধরা যাক, কোনও গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সমীরবাবুর কাছে আছে।"

বললাম, "আজ দুপুরেও সেই সুযোগ তার ছিল। সমীরবাবুর মা—"

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, "জনি ওয়াকার স্কচ বলে দিচ্ছে এক্স ওটা এয়ারপোর্টে কিনেছিল বিদেশ থেকে ফেরার সময়। আজ সকালের দিকে তার

ফ্লাইট ছিল সম্ভবত। অরিজিৎ! এয়ারপোর্টে তোমরা খোঁজ নাও, কোনও বিদেশযাত্রীর মর্নিং ফ্লাইটের টিকিট বাতিল হয়েছে কি না। তার মানে যে নামে টিকিট ছিল, সেই নামে কোনও লোক প্লেনে চাপেনি এবং ওয়েটিং লিস্টের কাউকে সেই আসনটা দেওয়া হয়েছে কি না। একটা টাইমলিমিট ঠিক করা যাক। অন্তত বেলা দশটা পর্যন্ত যে-সব প্লেন এয়ারপোর্ট ছেড়ে গেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেই দেখা যেতে পারে।"

ষষ্ঠী কফি আনল। অরিজিৎ টেলিফোন তুলে ডায়াল করার পর চাপা গলায় কার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ফোন রেখে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। চুমুক দিয়ে বললেন, "খোঁজ নিতে একটু সময় লাগবে। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানিয়ে দেব।"

বললাম, "প্লেনের বদলে এক্স যদি ট্রেনে যায়, তা হলে কি এ থিওরি টিকবে না?"

কর্নেল হাসলেন। "জনি ওয়াকার, ডার্লিং! কাজেই আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স প্লেন। তারপর ট্রেনের কথা ভাবা যাবে।"

"মোটাগাড়িকেই বা বাদ দেবেন কেন?"

কর্নেল ও অরিজিৎ একইসঙ্গে খুব হাসলেন। গম্ভীর হয়ে ভাবছিলাম, আমার প্রশ্নে কোনও বোকামি তো দেখছি না। তা হলে ওঁদের হাসির কারণ কী? কর্নেলের চোখে চোখ পড়তে বললেন, "মিঃ এক্সের মোটারগাড়িতে কোথায় যাওয়ার কথা ভাবছ তুমি? মোল্লার দৌড় মসজিদ। এয়ারপোর্ট অব্দি যেতে পারে। আর ট্রেনেই বা কোথায় যাবে সে? মিঃ এক্স যদি বোকা হয়, ট্রেনে—ধরো দিল্লি বা বোম্বাই যাওয়ার ঝুঁকি নেবে। আমার ধারণা সে অত বোকা নয়। বরং সে বিকেলে বা সন্ধ্যার একটা ফ্লাইটের চেষ্টা করবে।"

"তা হলে এয়ারপোর্টে খোঁজ নেওয়া উচিত, বিকেল বা সন্ধ্যার ফ্লাইটে সকালের ফ্লাইটের সেই যাত্রী গেছে কি না।"

অরিজিৎ বললেন, "তা গিয়ে থাকলে আমাদের পস্তাতে হবে অবশ্য।"

কর্নেল বললেন, "পস্তানোর আগে জানা দরকার সত্যি তেমন কিছু ঘটেছে কি না। এক : সকালের দিকে কেউ ফ্লাইট মিস বা ক্যানসেল করেছে কি না। দুই : সমীরবাবুর কসবার ফ্ল্যাটে কিছু চুরি গেছে কি না।"

"চুরি গেলে আমরা খবর পেতাম।"

"অরিজিৎ! আবার বলছি, আমরা অনেকসময় জানি না যে, আমরা কী জানি। সমীরবাবুর মা না-ও জানতে পারেন, তাঁর ছেলের কিছু হারিয়েছে কি

না।"

অরিজিৎ এক চুমুকে কফি শেষ করে বললেন, "সমীরবাবুর মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে দেখব নাকি? অবশ্য এ সময় ওঁর মার মানসিক অবস্থা—যাই হোক, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।"

পকেট থেকে খুদে নোটবই বের করে নাম্বার দেখে ডায়াল করলেন অরিজিৎ। কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও লাইন পেলেন না। অন্য একটা নাম্বারে ডায়াল করে চাপা স্বরে কিছু বললেন। তারপর ফোন রেখে দিলেন। "এক্সচেঞ্জ থেকে খোঁজ নিতে বললাম। এক্সচেঞ্জ যোগাযোগ করিয়ে দেবে। আমাদের পুলিশের কিছু বাড়তি সুবিধে আছে। জানেন তো জয়ন্তবাবু?" অরিজিৎ আমাকে সিগারেট দিয়ে বললেন। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়েছি, ফোন বাজল। অরিজিৎ ফোন তুলে সাড়া দিলেন, "হ্যাঁ ডিসি ডিডি এ লাহিড়ি বলছি। ...কী? ...কিন্তু শুধু ওই লাইনটাই—আই মিন, সমীর রুদ্রের... হ্যাঁ, হ্যাঁ, দ্যাটস দা নাম্বার।... সামথিং রং?... ওক্কে, ওক্কে! থ্যাংকস।" অরিজিৎ ফোন রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, "লাইনটা ডেড। অথচ আজ বেলা এগারোটায় সমীরবাবুর মা কোম্পানির অফিসে ফোন করেছিলেন। কর্নেল! আমি উঠি। ব্যাপারটা দেখা দরকার। আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আমি নিজেই গিয়ে দেখছি। সমীরবাবুর মায়ের সঙ্গে কথাও বলছি।"

কর্নেল বললেন, "উইশ য়ু গুড লাক!"

অরিজিৎ লাহিড়ি চলে যাওয়ার পর সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে বললাম, "হালদারমশাইয়ের ভাষায় বলা চলে প্রচুর রহস্য। বাপ্‌স! এবার আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। উঠে পড়া যাক।"

"এ সময় হালদারমশাইয়ের কিছু সাহায্য দরকার। দেখ তো জয়ন্ত, ওঁকে বাড়িতে পাও নাকি।"

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছি, রিং হল। ফোন তুলে সাড়া দিলাম। কোনও মহিলা কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে চাইছেন। বললাম, "কে বলছেন? নাম বলুন প্লিজ!"

"মিসেস চিত্রা মিত্র। লেকটাউন থেকে বলছি। আপনি কি কর্নেল—"

"না। ধরুন, দিচ্ছি।"

কর্নেল ফোন নিয়ে বললেন, "বলুন!... হ্যাঁ। বলছি।... দেখা করবেন? কী ব্যাপার?... আগামীকাল সকালে আটটার পর আসুন। সাড়ে আটটার মধ্যে কিন্তু।... ঠিক আছে।"

কর্নেল ফোন রেখে নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। বললাম, "আপনাকে বিরক্ত মনে হচ্ছে। মহিলাদের প্রতি আপনার প্রচুর সহানুভূতি দেখতে আমি অভ্যস্ত।"

"বিজ্ঞান প্রচারসমিতির প্রদীপ মিত্রের স্ত্রী।"

"দাম্পত্যকলহের মীমাংসা করে দিতে বলছেন না নিশ্চয়!"

"কতকটা তা-ই।"

"সে কী! আপনি ওঁকে তো আসতে বললেন!"

"না বললেও চিত্রা মিত্র আসতেন।" কর্নেল একটু হাসলেন। "ওঁর স্বামী কাঁটালিয়াঘাটের অবধূতের চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছেন। সেই নিয়ে ঝামেলা বেধেছে দুজনে। চিত্রা দেবীর কী একটা গোপন বক্তব্য আছে। আমাকে শুনতে হবে।" কর্নেল ফোন তুলে ডায়াল করলেন। একটু পরে বললেন, "মিঃ কে কে হালদার আছেন?... নেই?... কোথায় গেছেন?... ও! আচ্ছা।"

বললাম, "কোথায় গেছেন হালদারমশাই? কাঁটালিঘাটে নাকি?"

কর্নেল শুধু বললেন, "হুঁ।"...

বৈশম্পায়ন রায়

কর্নেল সরকার আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, অলৌকিক শক্তিকে আমি বিশ্বাস করি কি না। করি। খুবই বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাস সমীরের মৃত্যুর পর আরও দৃঢ় হল। কোনও এক অলৌকিক শক্তি অদৃশ্যভাবে থেকে মানুষকে চালাচ্ছে। আমিও তার ক্রীড়নক ছাড়া কিছু নই।

শুধু সমস্যা হল, অনি সেই যে বলেছিল, আমার নাকি বিবেক আছে, সেই বিবেক আমাকে প্রশ্ন করে মাঝেমাঝে। খচ খচ করে কাঁটার মতো বেঁধে প্রশ্নগুলো।

সমীর মানসিক অবসাদে ভুগছিল। কোম্পানির টাকা তছরুপের অভিযোগ ছিল ওর নামে। ওর বউ ওকে ছেড়ে কার সঙ্গে ভেগে গিয়েছিল। এমন অবস্থায় মানুষ আত্মহত্যা করে বসতেই পারে।

কিন্তু আমি ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম। আমার অনেক টাকা আছে। সেই টাকা ওকে দিতে পারতাম। কোম্পানির অভিযোগ থেকে সে নিষ্কৃতি পেত। আমার অফিসে ওকে কাজ দিতে পারতাম। সে বিয়ে করতে চাইলে ঘটকালিও করতে পিছপা ছিলাম না।

এখন মুনলাইট বারে সামনে হুইস্কির গ্লাস রেখে এইসব কথা আমার মনে আসছে। এসব কথা বিবেকের কথা।

অথচ কেন যে সেদিন ওকে এড়িয়ে গেলাম !

অলৌকিক শক্তির কি ইচ্ছা ছিল, আমি ওকে এড়িয়ে যাই ? আমি ওর কথা জেনে ওকে সাহায্য না করি ? ওর সঙ্গে পুরনো বন্ধুত্বে ফিরে না যাই ?

কেন ওকে দেখামাত্র প্রচণ্ড ঘৃণা আমাকে খেপিয়ে দিয়েছিল সেদিন ? পঁচিশবছর খুব কমসময় নয়। তবু আমার মধ্যে ঘৃণা উঠে এসেছিল।

অনির কথা ভেবেই কি ঘৃণা ? তা হলে বলতেই হবে, অনি এক সর্বনাশা মেয়ে। স্মৃতির ভেতর থেকে সে আমাকে প্ররোচিত করেছে।

নাকি অনির ছদ্মবেশে সেই অলৌকিক শক্তিই আমাকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিয়েছে। সেই অদৃশ্য শক্তিই সমীরকে মেরে ফেলেছে। সমীরের হাতে সে-ই রিভলভার তুলে দিয়েছিল গতরাত্রে। কেউ ওকে বাঁচাতে পারত না।

হাসপাতালের মর্গে এখনও হয়তো সমীরের অফিসের কলিগ্‌রা, ওর পাড়ার ছেলেরা আর ওর আত্মীয়স্বজন বডি ফেরতের জন্য অপেক্ষা করছে। সমীর নিছক বডি হয়ে গেছে, ভাবতেই বুকটা কেঁপে উঠছে। আমার নিজেকেও আর বিশ্বাস হচ্ছে না। কোন অমোঘ নির্দেশে আমিও নিছক বডি হয়ে যেতে পারি। আমার শরীর নিঃসাড় হয়ে গেল কথাটা ভাবতে গিয়ে।

চাংকো কাছে এসে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "এনিথিং রং স্যার ?"

বললাম, "থ্যাংকস্ চাংকো। আই অ্যাম অলরাইট !"

চাংকো আমার দিকে নজর রেখেছে কেন ? একটু অস্বস্তি হল। গেলাস শেষ করে ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে সাতটা বাজে। এতক্ষণ কর্নেল সরকার ফিরেছেন হয়তো। ওঁর সঙ্গে দেখা করা খুবই দরকার। এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। ওঁর সঙ্গে আলোচনা করা উচিত।

বেরিয়ে গিয়ে একটু ভেবে নিলাম। উত্তেজনা থিতিয়ে যাক। আমার মাথার ভেতরটা কেমন করছে। বাড়ি ফিরে কর্নেলসায়েবকে রিং করে তারপর যদি দরকার হয়, যাব। ওঁর বাড়ির লোকটাকে তো বলেই এসেছি রিং করব।

কালো অ্যাম্বাসাডার সাবধানে গড়াচ্ছিল। কসবায় সমীরের মায়ের কাছে আবার যেতে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছেটা দমন করলাম। ওই বোবা চাহনি আমাকে বিব্রত করবে। আমার আশ্চর্য লেগেছে, সমীর আমাকে দেখামাত্র চিনেছিল। তার মা চিনতে পারেননি। ওঁকে যখন প্রশান্ত সান্যালের ফ্ল্যাট থেকে হাসপাতালের মর্গে নিয়ে গেলাম, তখনও ওঁর মনে পড়ছিল না আমি কে। সেখান থেকে কসবায় নিয়ে গেলাম। তারপর শুধু একবার জড়ানো গলায় বললেন, "ও ! তুমি বাসু ?" কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞেস করলেন না আমার

বাবা-মা সম্পর্কেও। হয়তো জিজ্ঞেস করার সময় এটা নয়।

শুধু মাঝেমাঝে বোবার চাহনিতে আমাকে দেখছিলেন। সত্তরবছর বয়সী বৃদ্ধার পুত্রশোকে কাঁদতেও কষ্ট হয়। মনের শোকের হাহাকার জরাগ্রস্ত শরীর দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এইটে দেখেই আমি বিব্রত বোধ করেছি।

লেকটাউন পৌঁছুতে একঘণ্টার বেশি সময় লাগল। গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠতে গিয়ে টের পেলাম হাঁপাচ্ছি। ঘামছি। জিভ শুকনো।

জামাকাপড় বদলে বাথরুমে গেলাম। স্নান করব ভাবলাম। করলাম না। কাজের ছেলেটি দেশে গেছে। তবে আমি নিজের কাজ নিজে করতে ভালবাসি। দেশ থেকে ফিরলে ওকে টাকাকড়ি দিয়ে বিদায় দেব। ছেলেটিও চাংকোর মতো আমার দিকে সবসময় যেন বড্ড বেশি নজর রাখে।

এক কাপ কফির লিকার নিয়ে ব্যালকনিতে বসলাম। তাহলে সমীর রুদ্র মরে গেল? আবার মাথার ভেতর ঠাণ্ডা হিম ঢিল গড়িয়ে গেল।

সেই প্রশ্নটাও আবার ফিরে এল। সমীরের মৃত্যুটা যদি আত্মহত্যা না হয়ে হত্যা হয়?

হত্যা কেন হবে?

যদি হয়?

হত্যার একটা মোটিভ থাকে। ওকে হত্যার মোটিভ কী থাকতে পারে?

ধরা যাক, কাউকে ব্ল্যাকমেল করত। সে ওর মুখ বুজিয়ে দিয়েছে চিরকালের মতো। ধরা যাক না, ওয়াশিংটনবাসী প্রশান্ত সান্যাল নামে একটা লোককে সে ব্ল্যাকমেল করত বলে সেই প্রশান্ত সান্যাল তাকে ফ্ল্যাটটা ব্যবহার করতে দিয়েছিল। এও ধরা যেতে পারে, সেই ফ্ল্যাটে সমীর মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তি করত। তারপর ধরা যাক, অফিসের টাকা তছরুপ করার পর সমীর দায়ে পড়ে প্রশান্ত সান্যালের কাছে অনেক বেশি টাকার দাবি করেছিল। শেষে প্রশান্ত সান্যাল এসে তাকে গুলি করে মেরে আজই কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে। যাবার সময় ব্ল্যাকমেল-সংক্রান্ত ডকুমেন্ট উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। এটা তো হতেই পারে।

তা পারে। কিন্তু সেই ডকুমেন্ট ওই ফ্ল্যাটে রাখার পাত্র সমীর নয়। কসবায় নিজের ফ্ল্যাটে রেখেছিল।

তা হলে প্রশান্ত সান্যালকে সেখানে যেতে হয়েছিল।

গিয়েছিল।

কিন্তু কখন? তা ছাড়া কসবার ফ্ল্যাটে সমীরের মা ছিলেন।

এগারোটা অব্দি ছিলেন। তারপর চলে আসেন শেক্সপিয়ার সরণির ফ্ল্যাটে

ছেলের খোঁজে। এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে প্রশান্ত কসবার ফ্ল্যাটে ঢোকার সুযোগ পেতে পারে।

সব ঠিক আছে বাসু, যদি শেষমেষ ঘটনাটা স্যুইসাইড না হয়ে হোমিসাইড হয়।

হ্যাঁ, যদি হোমিসাইড অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড হয়।...

কফি শেষ করে ঘরে ঢুকলাম টেলিফোন করতে। কর্নেল সরকারকে করব, নাকি অরিজিৎকে? প্রথমে কর্নেল সরকারকেই করা যাক। দেখি, উনি কী ভাবছেন।

ডোর-বেল বাজল। চমকে উঠলাম। আই হোলে চোখ রেখে দেখলাম চিত্রা দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলে বললাম, "কী ব্যাপার চিত্রা? এমন অসময়ে।"

চিত্রা বলল, "আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, বাসুদা!"

ব্যালকনিতে বসলাম দুজনে। চিত্রা চাপা গলায় বলল, "আজকের সত্যসেবক পত্রিকা দেখেছেন বাসুদা?"

"না তো! কেন?"

"আপনার গুরুদেব প্রদীপকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রদীপ জেদ ধরেছে, আগামীকালই ওঁর আশ্রমে যাবে। আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন বাসুদা!"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে ফেললাম। "যে অবিশ্বাসী, তাকে কিছু বুঝিয়ে বলা যায় না চিত্রা!"

চিত্রা একটু চুপ করে থেকে বলল, "মানুষ সাধনার বলে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারে, এটা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু প্রদীপ বিশ্বাস করে না। তবে সেই অবিশ্বাস থেকে প্রদীপ আপনার গুরুদেবের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছে না।"

একটু অবাক হয়ে বললাম, "তার মানে?"

চিত্রা ফিসফিস করে বলল, "প্রদীপ নাকি আপনার গুরুদেবকে চিনতে পেরেছে। ওঁর পূর্বাশ্রম সম্পর্কে অনেক ইনফরমেশন যোগাড় করেছে।"

"কী ইনফরমেশন?"

"আমাকে তো বলছে না খুলে। শুধু বলছে, এবার টিটি পড়ে যাবে দেশে।"

লকেটটা বের করে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে বললাম, "ইনি আমার সে-অর্থে গুরুদেব নন, চিত্রা! আমি এঁর মুখোমুখি কখনও হইনি। এক বন্ধু আমাকে এটা ধারণ করতে দিয়েছিল। ধারণ করে ফল পেয়েছি। এজন্যই এটা আমি সবসময় সঙ্গে রাখি।"

চিত্রা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। "প্লিজ বাসুদা! ওকে আপনি যেভাবে পারুন,

আটকান। আমার মন বলছে, ওর কোনও ক্ষতি হবে।

"প্রদীপ আছে বাড়িতে ?"

"না। ওর ক্লাবে আছে। দলবল নিয়ে যাবে।"

"ওরা কখন যাবে, জানো ?"

"দুপুরের দিকে বেরুবে। রাত্রে সেখানে থাকবে।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "প্রদীপ আমার কথা শুনবে বলে মনে হয় না, চিত্রা! ওর কাছে কী ইনফরমেশন আছে, তা-ও আমাকে বলবে না। বরং তুমি কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য নাও। তিনি প্রদীপের সঙ্গে কাল সকালের মধ্যেই যোগাযোগ করে এটা সেট্‌ল্ করে ফেলতে পারবেন। কিংবা ধরো, প্রদীপের সেফটির ব্যবস্থাও করতে পারবেন।"

চিত্রা হতাশভঙ্গিতে বলল, "কিন্তু কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভকে আমি তো চিনি না!"

একটু দ্বিধার পর বললাম, "কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নামে একজন আছেন। তাঁর ফোন নম্বর দিচ্ছি। কিন্তু দুটো শর্ত। আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ের কথা বলবে না এবং ওঁকে ভুলেও ডিটেকটিভ বলবে না। শুধু বলবে, আপনার পরামর্শ চাই। যদি পাত্তা না দেন, একটা ট্রিকস্ কি তোমার মাথায় আসবে না ?"

"আসবে। বলব, গোপন কিছু কথা-টথা আছে।"

চিত্রা হাসছিল। আমি একটুও হাসছিলাম না। লকেটের ছবিটা সম্পর্কে আজ সকালে কর্নেল সরকার আমাকে সচেতন করেছেন। সারাদিন ধরে বারবার দেখেছি। এঁকে আমার চেনার দরকার ছিল না একদিন। সমীরের মৃত্যুর পর দরকার হচ্ছে। আসলে অনির স্মৃতি আমার অস্তিত্বে ঝড় হয়ে ফিরেছে। অনির সঙ্গে এই ছবিটার বা অলৌকিক শক্তিধর মানুষটার একটা গোপন যোগসূত্র আমাকে বারবার তাতিয়ে দিচ্ছে। পুরনো স্মৃতি ঝাঁপিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছে আমাকে।

চিত্রা ফোন নম্বর পেয়ে আমার টেলিফোনের সামনে বসে পড়ল। ব্যালকনিতে ফিরে গিয়ে বসলাম। চিত্রা ফোন করে এসে উজ্জ্বল মুখে বলল, "আগামীকাল মর্নিংয়ে আটটা থেকে সাড়ে আটটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। থ্যাংকস বাসুদা। চলি।"

চিত্রা চলে গেলে আমি লকেটটা আবার মাথায় ঠেকালাম। প্রভু,অপরাধ ক্ষমা কোরো। আমি শুধু একটা কথাই জানতে চাই। আর কিছু না। অনির আত্মার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী ? তুমি কি তাকেই লড়িয়ে দিয়েছ আমার সঙ্গে ? বেশ

কিছুক্ষণ পরে টেলিফোনের কাছে গেলাম। কর্নেল সরকারকে এবার রিং করা উচিত। আমার হাত কাঁপছিল। সমীরের আত্মা যেন এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। উজ্জ্বল আলোয় ভরা ঘরে আতঙ্ক।

এনগেজড টোন। কয়েকবার চেষ্টার পর লাইন পেলাম। "কর্নেল সরকার! আমি ভি রায় বলছি।"

"বলুন মিঃ রায়!"

"সমীরের শোচনীয় মৃত্যুর পর—"

"দ্যাটস আ মার্ডার, মিঃ রায়!"

"মার্ডার? বাট হাউ—"

"সমীরবাবু লেফ্‌টহ্যান্ডার ছিলেন। ন্যাটা। ওঁর অফিসের কলিগদের কাছে কিছুক্ষণ আগে পুলিশ জানতে পেরেছে। কাজেই মার্ডার। মার্ডারার—"

"কর্নেল সরকার! মার্ডারার প্রশান্ত সান্যাল নয় তো?"

"কেন প্রশান্ত সান্যাল?"

"নিছক সন্দেহ। তার ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছিল সমীরকে। ব্ল্যাকমেল হতে পারে।"

"কিন্তু সান্যাল তো ওয়াশিংটনে।"

"কর্নেল সরকার! এয়ারপোর্টে খোঁজ নেওয়া উচিত। ওই নামের কোনও যাত্রী—"

"য়ু আর ইনটেলিজেন্ট্ মিঃ রায়। আজ ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের লন্ডন- আবুধাবি-কলকাতা-হংকং মর্নিং ফ্লাইটে হংকংয়ের একজন যাত্রীর টিকিট ছিল কলকাতা থেকে। পি সান্যাল নাম। কিন্তু সেই যাত্রী—"

"ফ্লাইট মিস করেছে?"

"এগেন—য়ু আর ভেরি ইনটেলিজেন্ট মিঃ রায়! পি সান্যাল সকালের ফ্লাইট মিস করেছে। ওদিকে সমীরবাবুর কসবার ফ্ল্যাট থেকে একটা হ্যান্ডব্যাগ চুরি গেছে।"

"দেন ইট ওয়জ আ কেস অব ব্ল্যাকমেলিং!"

"ইট অ্যাপিয়ারস্ সো।"

"কর্নেল সরকার! হোয়াই ইট অ্যাপিয়ারস্ সো?"

"আপনি সম্ভব হলে অফিস যাওয়ার পথে একবার আসবেন। কথা হবে। ছাড়ছি।"

ফোন রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তা হলে আমার থিওরির

সঙ্গে কর্নেল সরকারের থিওরি মিলে গেছে ! আমি যা-যা ভেবেছি, তা-ই উনিও ভেবেছেন। নিজের বুদ্ধিসুদ্ধি সম্পর্কে আমার কিছু আস্থা ছিল। সেই আস্থা বেড়ে গেল। শুধু ওই কথাটা—'ইট অ্যাপিয়ারস সো' একটু কানে বাজল। উনি বলতে চাইছেন, 'আপাতদৃষ্টে তাই মনে হচ্ছে।' কেন আপাতদৃষ্টে ?

কিন্তু সমীর যে ন্যাটা ছিল, এ কথাটা আমার মনে ছিল না। আসলে পঁচিশটা বছর কম সময় নয়। কর্নেল সরকার কথাটা বলামাত্র মনে পড়ে গেছে, সমীর ন্যাটা ছিল। বাঁহাতে লিখত। বাঁহাতে খেত। সেই নিয়ে অনি ওকে খুব ঠাট্টা করত। বলত, "তুমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বাঁহাতে খেলে কিন্তু কেলেংকারি ! ডানহাতে খাওয়া প্র্যাক্টিস করে নাও।"

সমীর আমার সামনেই বলত, "অনামিকা সেন নামে কাউকে বিয়ে করলে কেলেংকারি হবে না।"

অনি বলত, "অনামিকা সেন কোনও ন্যাটার বউ হবে না।"

অনি ছিল সব সময় স্মার্ট, তেজী, দুঃসাহসী আর অ্যাডভেঞ্চারার টাইপ মেয়ে। দীঘায় আমার সঙ্গে আসলে একটা অ্যাডভেঞ্চার করতেই গিয়েছিল। নিজের সাহসের পরীক্ষা দিতে আর আত্মরক্ষায় নিজের পটুতা বুঝে নিতে। নাহ, সমুদ্রদর্শন একটা ছুতো মাত্র।

আবার কথাটা ধাক্কা দিল আমাকে, 'সমীর ন্যাটা ছিল।' ন্যাটা লোক বাঁহাতে রিভলভার ধরে নিজের মাথার ডানদিকে গুলি চালাতে পারে না। একটু মদ্যপান করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বেশি খেয়ে ফেলার ভয়ে ঘরে মদ রাখি না। ঘড়ি দেখলাম। মদের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও বারে যাব কি ?

আর বেরুতে ইচ্ছে করছে না। শরীরের ওজন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ব্যালকনির আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বসে রইলাম। এতক্ষণে মনে হল, সেদিন মুনলাইট বারে সমীরের সঙ্গে দেখা হয়ে না গেলে আমার জীবন যেমন চলছিল, তেমনই চলত।

জড়িয়ে যাওয়া একটা সুতোর খেই হয়ে সমীর আমার সামনে এসেছিল। খেই ধরে টানতে গিয়েই অনিবার্যভাবে অনি এসে পড়েছিল। অমনি আমি বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। তারপর যা-যা করেছি, অদ্ভুত দুঃস্বপ্নের ঘোরে করে ফেলি।

নাহ্। এসব করতে যাওয়া ঠিক হয়নি। বেশ তো ছিলাম।...

খুনজখম আর রহস্যের মারপ্যাঁচে মাথার ভেতরটা যখন ঘুলিয়ে উঠেছে, সেই সময় প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইয়ের কাঁটালিয়াঘাট যাত্রার খবর চমৎকার রিলিফ। হালদারমশাই মানুষটা পুলিশজীবনে কেমন ছিলেন বিশেষ জানি না। কিন্তু বেসরকারি গোয়েন্দা জীবনে অদ্ভুত ধরনের খেয়ালি। খেয়ালের চোটে বিপদে-আপদে বহুবার ওঁকে সাংঘাতিক ভুগতে দেখেছি। অথচ পরে সেই ভোগান্তি চমৎকার ভুলে যান।

রাতে শুয়ে পড়ার সময় হঠাৎ মনে হল, এক রহস্যের পাশাপাশি আরেক রহস্য উঁকি মারছে না তো? বিজ্ঞান প্রচার সমিতির প্রদীপ মিত্রের স্ত্রী সকালে কর্নেলকে কোনও গোপন কথা বলতে আসছেন। তার মানে, কর্নেলের ডাইনে-বাঁয়ে দুই রহস্য এসে গেছে।

অবশ্য বহুবার কর্নেলকে ডাইনে-বাঁয়ে কেন, সামনে-পেছনেও রহস্যের জটিল বাণ্ডিলে ফাঁদে পড়া প্রাণীর মতো আঁকুপাকু করতে দেখেছি। এই বুড়োবয়সে পারেনও বটে।

রাত দশটায় চোখের পাতা ঘুমে টেনে ধরেছে, হঠাৎ বিরক্তিকর ফোনের শব্দ। পত্রিকা অফিস থেকে কোনও জরুরি তলব ভেবে ফোন তুলতেই বললাম, "রং নম্বার।"

"রাইট নাম্বার ডার্লিং! ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য দুঃখিত।"

"সুখী করার মতো সুসমাচার আছে নিশ্চয়? হালদারমশাই আশা করি অবধূত-রহস্য ফাঁস করে ফিরে এসেছেন।"

"না জয়ন্ত! সমীরবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে আমার থিওরিতে তোমার অবিশ্বাস ঘোচাতে এই খবরটা দেওয়ার ইচ্ছে হল। আমার চোখ এড়ায়নি জয়ন্ত! তোমার মুখে অবিশ্বাস শুধু নয়, বাঁকা হাসিও দেখেছি। বিশেষ করে তুমি—"

"ওঃ হো! ব্যাপারটা বলবেন তো?"

"সমীরবাবুকে সত্যিই খুন করা হয়েছে। তার শক্ত প্রমাণ একটু আগে পাওয়া গেছে।"

"শক্ত প্রমাণ? ইটের না পাথরের?"

"সমীরবাবু ন্যাটা—লেফ্‌টহ্যান্ডার ছিলেন। কোনও ন্যাটালোক নিজের মাথার ডানদিকে গুলি করে আত্মহত্যা করতে পারে না।"

"বস্! আপনার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা টের পাচ্ছি।"

"ও কিছু না। তুমি শুনলে অবাক হবে, কসবার ফ্ল্যাট থেকে সমীরবাবুর একটা হ্যাণ্ডব্যাগ চুরি গেছে—মানে, পাওয়া যাচ্ছে না।"

"আপনার থিওরি সেন্ট পারসেন্ট কারেক্ট প্রমাণিত হল। আনন্দে ঘুমিয়ে পড়ুন।"

"আনন্দ কোথায় ? আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কেউ আমাকে লাল হেরিং মাছের পেছনে ছোটাচ্ছে। য়ু নো দা টার্ম ডার্লিং ! 'চেজিং আফটার আ রেড হেরিং।' মরীচিকা, জয়ন্ত ! আমি কি মরীচিকার পেছনে ছুটছি ?"

"এবার আপনার গলায় বিষাদ-সঙ্গীতের সুর, বস্ !"

"হুঁ, আর একটা ব্যাপার দেখ। সমীরবাবুর মা প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঙ্গে তাঁদের গাড়িতে রোজ ভোরে গঙ্গাস্নানে যান। আজও গিয়েছিলেন। সেই দম্পতির কিশোরী নাতনিকে ফ্ল্যাটে রেখে গিয়েছিলেন সমীরবাবুর মা গৌরী দেবী। কারণ গতরাত থেকে সমীরবাবু বাইরে আছেন এবং সকালে ফিরতে পারেন। তো মেয়েটি বলেছে, তিন-চারবার ফোন করে কেউ জানতে চেয়েছিল গৌরীদেবী আছেন কি না। শুনে সে বলেছিল, গৌরীদেবী ফিরলেই যেন ছেলের খোঁজ করেন। গৌরীদেবী আজ গঙ্গাস্নানের পর বালিগঞ্জে তাঁর বোনঝির কাছে নেমে যান। প্রায় সাড়ে দশটা অব্দি সেখানে ছিলেন। বাড়ি ফেরার পর মেয়েটির মুখে ফোনের খবর শুনে ব্যস্তভাবে তার অফিসে ফোন করেন। তারপর—"

"হালদার মশাইয়ের ভাষায় প্রচুর রহস্য এবার ঘনীভূত রহস্য হল।"

"অবশ্যই ঘনীভূত হল। প্রতিবেশী মৈত্রেয়দম্পতির নাতনির ডাকনাম মিম্মি। গৌরীদেবীর নাকি ভীষণ চোরের বাতিক। তাই কাজের লোক রাখেন না। তবে মিম্মিকে বিশ্বাস করেন। তাই ফ্ল্যাট ছেড়ে গেলে মিম্মিকে নজর রাখতে বলেন। স্কুলে পুজোর ছুটি। মিম্মি বাড়িতেই ছিল এবং গৌরীদেবীর ফ্ল্যাটে রেকর্ডপ্লেয়ার বাজিয়ে সময় কাটাচ্ছিল। টু মেক ইট শর্ট, জয়ন্ত, গৌরীদেবী ছেলের খোঁজে চলে আসার পর কারও ওঁর ফ্ল্যাটে ঢোকার চান্স ছিল না। মিম্মি ওয়জ দেয়ার। কাজেই সমীরবাবুর হ্যান্ডব্যাগ হারানো এবং সেটা আজই হারানো একটা নতুন প্রশ্ন এনেছে। আর একটা ঘটনা ফোনের তার ছেঁড়া নীচের টেলিফোন বক্সে।"

"থাক্ কর্নেল ! আমার মাথায় ভীমরুল ঢুকে গেছে।"

"আমারও।...হ্যালো ! হ্যালো !"

"বলুন।"

"সকাল আটটার মধ্যে চলে এসো। তোমাকে একটা জরুরি কাজের দায়িত্ব

দেব। হালদারমশাই নেই বলেই—না ডার্লিং, গোয়েন্দাগিরি নয়! তুমি রিপোর্টার হওয়ায় অনেক সুবিধে আছে। এটা তুমি সহজে পারবে।"

"আপনি না বললেও যেতাম। চিত্রদর্শনে—সরি! চিত্রাদর্শনে!"

"হাঃ হাঃ হাঃ! রাখছি ডার্লিং! হ্যাভ আ নাইস স্লিপ।"

যাক্, বৃদ্ধ ঘুঘুপ্রবরকে হাসাতে পেরেছি। হাসি উত্তেজনা দূর করে। কিন্তু নিজের উত্তেজনাটি আমার মাথায় পাচার করে দিলেন দেখছি। জরুরি কাজটা কী ধরনের হতে পারে ভেবে পেলাম না। 'নাইস স্লিপের' বারোটা বেজে গেল।

সকালে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে প্রায় সওয়া আটটা বেজে গেল। ড্রয়িং রুমে ঢুকে চোখ জ্বলে গেল বলা চলে। কিন্তু কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন না চিত্রা মিত্রের সঙ্গে। আমাকে ইসারায় বসতে বলে তাঁকে বললেন, ঠিক আছে। আমি দেখছি। তবে কথা দিতে পারছি না। কারণ খবরের কাগজে আপনার স্বামীর যে-সব কীর্তিকলাপ পড়েছি, তাতে আমার ধারণা হয়েছে, উনি জেদী এবং দুঃসাহসী মানুষ। আমার পরামর্শে কান দেবেন না। আর আপনি বলছেন টেলিফোনে হুমকি দেওয়ার কথা। কাগজেই পড়েছি, প্রদীপবাবুকে এধরনের হুমকি বহুবার দেওয়া হয়েছে। এটা তো আপনারও জানার কথা।"

চিত্রা বললেন, "তাহলে ওর সেফটির ব্যবস্থা করুন।"

কর্নেল হাসলেন। "সরি মিসেস মিত্র! আমি বডিগার্ড সাপ্লায়ার নই।"

"না, না! কথাটা ওভাবে নেবেন না কর্নেল সরকার!" চিত্রা একটু বিব্রতভাবে বললেন। "বডিগার্ডের কথা আমি বলছি না। আসলে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, ওর যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, তেমন কোনও ব্যবস্থা করুন। আমি জানি, আপনি এটা পারেন।"

"আপনি জানেন? তার মানে, কেউ কি আপনাকে বলেছে আমি এধরনের কাজ করি?"

চিত্রা আস্তে বললেন, "শুনেছি।"

কর্নেলের জেরার মুখে সুন্দরীর সৌন্দর্য বেঁকেচুরে গেল। আমার খারাপ লাগছিল। কর্নেলকে মেয়েদের ব্যাপারে এমন কড়া হতে কখনও দেখিনি। চিত্রা ঠোঁট কামড়ে ধরে আঙুল খুঁটতে থাকলেন।

কর্নেল বললেন, "কেউ আপনাকে বলেছে আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

চিত্রা তাকিয়েই মুখ নিচু করলেন। আস্তে বললেন, "হুঁ।"

"প্রদীপবাবু কাঁটালিয়াঘাটের অবধূতের কোনও গোপন তথ্য জানেন বলছিলেন। কী ধরনের গোপন তথ্য বলে আপনার ধারণা?"

"আপনাকে তো বলেছি, আমাকে ও কিছুই খুলে বলেনি। তবে অবধূতজির পূর্বাশ্রম সম্পর্কে নাকি ইনফরমেশন জোগাড় করেছে।"

"আপনি লেকটাউনে ব্লক এ-তে থাকেন ?"

"হ্যাঁ। আচার্য রোডে।"

"আপনি তাহলে মিঃ ভি রায়—বৈশম্পায়ন রায়কে চেনেন ?"

চিত্রা একটু ইতস্তত করে বললেন, "হুঁ।"

কর্নেল হাসলেন। "কেন বলছেন না তিনিই আপনাকে আমার কথা বলেছেন ?"

"আসলে বাসুদা আমাকে নিষেধ করেছিলেন।"

"কী আশ্চর্য! ওঁর কথা বললে এতক্ষণ বাজে সময় নষ্ট হত না। ঠিক আছে। প্রদীপবাবুর সেফটির ব্যবস্থা আমি করব।"

চিত্রা খুশি মুখে উঠে দাঁড়ালেন।

কর্নেল বললেন, "একটা কথা মিসেস মিত্র! আজকের কাগজ পড়েছেন ?"

"না। আমি মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়েই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। কেন বলুন তো ?"

"আপনি কোন্ কাগজ পড়তে ভালবাসেন ?"

"সত্যসেবক পত্রিকা পড়তে আমার ভাল লাগে।"

কর্নেল মিষ্টিমিষ্টি হেসে বললেন, "তা হলে আলাপ করিয়ে দিই। দৈনিক সত্যসেবকের সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি! আর জয়ন্ত, ইনি বিজ্ঞান প্রচার সমিতির মিঃ প্রদীপ মিত্রের স্ত্রী মিসেস চিত্রা মিত্র।"

চিত্রা হাসিমুখে নমস্কার করলেন আমাকে। তারপর বসে পড়লেন। বললেন, "আপনাদের কাগজ আমি খুঁটিয়ে পড়ি। আচ্ছা জয়ন্তবাবু, রূপচর্চার পাতায় আমি কিছু লিখতে চাই। একটু হেল্প করতে পারেন না আমাকে ? শুনেছি, চেনা-জানা না থাকলে সত্যসেবকে লেখা ছাপানো যায় না। আপনি যদি—"

আমি কথা বলতে যাচ্ছি, কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে টেবিল থেকে আজকের সত্যসেবক পত্রিকা তুলে নিয়ে বললেন, "মিসেস মিত্র! আজকের সত্যসেবক পড়ে দেখুন!"

আমি যেমন, তেমনি চিত্রাও যেন একটু অবাক হলেন। তারপর কাগজটা নিয়ে প্রথম পাতায় চোখ রেখেই চমকে উঠলেন। আস্তে বললেন, "সে কী!"

কর্নেলও আস্তে বললেন, "কোনও সেনসেশন্যাল খবর আছে বুঝি ?"

চিত্রার মুখে তীব্র উত্তেজনার ছাপ লক্ষ করলাম। বললেন, "আমার পরিচিত

এক ভদ্রলোক স্যুইসাইড করেছেন।"

"ভদ্রলোককে আপনি চিনতেন নাকি ?"

"হ্যাঁ। মানে, একটু-আধটু চিনতাম।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,"আজকাল স্যুইসাইড খুব বেড়ে যাচ্ছে। মানুষের ফ্রাস্টেশন বাড়ছে। ব্যাপারটা হল, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে তুলেছে, যার সঙ্গে বাস্তব জীবনকে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে আত্মিক সংকট এসে যাচ্ছে।"

চিত্রা দ্রুত বললেন, "সমীরদার স্ত্রীই এ জন্য দায়ী।"

"আপনি চিনতেন নাকি ?"

"একটু-আধটু চিনতাম। কসবায় সমীরদা যে বাড়িতে থাকত, সেই বাড়িতে আমার দিদি থাকেন। স্কুলটিচার। সেই সূত্রে আলাপ হয়েছিল। আচ্ছা, আমি উঠি।" চিত্রা আবার উঠে দাঁড়ালেন।

কর্নেল বললেন, "কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন ? ভদ্রলোক নিজের ফ্ল্যাটে স্যুইসাইড না করে শেক্সপিয়ার সরণিতে অন্য একজনের ফ্ল্যাটে গিয়ে স্যুইসাইড করেছেন! অদ্ভুত ব্যাপার না ?"

চিত্রা আস্তে বললেন, "স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর সমীরদা মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে থাকত। দিদির কাছে শুনেছি। আচ্ছা, চলি!"

"মিসেস মিত্র! বরং এক কাজ করুন। আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে কাঁটালিয়াঘাটে চলে যান। স্বামীর সেফটি স্ত্রীই বেশি দিতে পারেন। আপনি যেভাবেই হোক, ওঁর সঙ্গে চলে যান। আমি তো আছিই। আড়াল থেকে লক্ষ রাখব।"

"আমি যাব ? কিন্তু আমার মেয়ে কার কাছে থাকবে ?"

"মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যান। আপনার মেয়ে নিশ্চয় ইংলিশ মিডিয়ামে কোনও খ্রিশ্চিয়ান মিশনারি স্কুলের ছাত্রী! না—এটা জানায় ডিটেকটিভের বাহাদুরি নেই। মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন বললেন। অন্যান্য স্কুলে এখন পুজোর ছুটি। কাজেই এটা অনুমান করা খুব সহজ।"

চিত্রার চোখেমুখে যে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, মুছে গেল। কিন্তু বিষণ্ণতার গাঢ় ছাপটা আবার ফিরে এল। বললেন, "আপনি কি লোক পাঠাবেন, না নিজে যাবেন ?"

"আমি নিজে যাব।"

"থ্যাংকস কর্নেল সরকার!" বলে চিত্রা মিত্র চলে গেলেন। সত্যসেবক

পত্রিকায় রূপচর্চার পাতায় লেখার ব্যাপারে আর কোনও কথা তুললেন না এবং আমাকে প্রাপ্য নমস্কারটি পর্যন্ত দিলেন না। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "কী বুঝলে জয়ন্ত ?"

আপনার জেরার পদ্ধতিটি অভিনব।

"তত কিছু অভিনব নয়। আমার বরাবরকার একটি তত্ত্ব হল, সত্য জিনিসটা অসংখ্য ফালতু জিনিসের মধ্যে গাঢাকা দিয়ে থাকে। তাই ফালতু জিনিসগুলো উল্টেপাল্টে দেখা উচিত।"

ষষ্ঠী এসে বলল, "বেকফাস রেডি, বাবামশাই !"

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, "এস জয়ন্ত, আগে ষষ্ঠীর বেকফাস শেষ করে নিই। তারপর অন্য কাজ।"

ডাইনিংয়ে ঢুকে বললাম, "আমি কিন্তু বেকফাস সেরে বেরিয়েছি। শুধু এককাপ কফি খাব।"

ষষ্ঠীচরণ গম্ভীরমুখে বলল, "না হয় মুখ ফস্কে বেইরেই গেছে। বেরেকফাস্ট্ বেরেকফাস্ট্ ! নিন, এবার হল তো ?"

বলে সে কিচেনে ঢুকে গেল। কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "না রে ষষ্ঠী ! তুই বেকফাস্ট বল্ কিংবা বেরেকফাস্টই বল্, জিনিসটা তো একই। হালদারমশাই বলেন ব্র্যাকফাস্ট্। তাতেও কি এই খাদ্যের স্বাদ বদলে যায় ? বসে পড়ো জয়ন্ত ! ষষ্ঠীকে বলা ছিল তোমার কথা। কাজেই তুমি না খেলে ষষ্ঠী রাগ করবে।"

কর্নেলের স্বভাব খাওয়া-দাওয়ার সময় ঘোর নীরবতা পালন। ওঁর মতে, খাওয়ার সময় কথা বললে—এক : খাদ্যের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয়, দুই : গলায় আটকে যেতে পারে, তিন : কথার ভেজাল মিশলে খাদ্য ঠিক মতো হজম হয় না ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পরে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মুখ খুললেন। "সুন্দরীরা যদি নিজের রূপ সম্পর্কে বেশি সচেতন হন, তা হলে তাঁদের বুদ্ধির উৎকর্ষে ঘাটতি পড়ে। মিসেস মিত্রকে অবশ্য বোকা বলব না, তবে চিন্তাধারায় বেজায় সাদাসিধে। এধরনের মহিলাদের কাছ থেকে সহজে পেটের কথা আদায় করা যায়।"

"কিন্তু সমীরবাবু ওঁর পরিচিত, এটা কি অলৌকিক শক্তির সাহায্যে জানতে পেরেছিলেন ?"

"নিছক একটা চান্স নিয়েছিলাম। মিঃ রায় ওঁকে পাঠিয়েছেন। তাই অন্ধকারে

একটা ঢিল ছুড়লাম। লেগে গেল।" কর্নেল কফিতে চুমুক দিলেন। "যে-কোনও রহস্যের সঙ্গে বহু আকস্মিকতার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, জয়ন্ত!"

"মিঃ রায় ওঁকে বলতে নিষেধ করেছিলেন—"

"সেটা স্বাভাবিক। এধরনের নাছোড়বান্দা মহিলার চাপে পড়েই আমার নাম ঠিকানা দিয়ে থাকবেন। ওঁর একটা কেস আমি নিয়েছি। এ অবস্থায় আরেকটা কেস আমার ওপর চাপালে আমি বিরক্ত হতেই পারি। তাই নিষেধ করে থাকবেন। তাছাড়া উনি জানেন, ডিটেকটিভ কথাটা সম্পর্কে আমার প্রচণ্ড অ্যালার্জি আছে।"

"কিন্তু আপনি কি সত্যিই কাঁটালিয়াঘাটে যাবেন নাকি?"

"দেখা যাক। তবে মিসেস মিত্রের উদ্বেগ আমাকে টাচ করেছে।" কর্নেল হঠাৎ একটু গম্ভীর হলেন। "প্রদীপ মিত্রের এক লক্ষ টাকা বাজি ধরার ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না। ওঁর স্ত্রীর কাছে শুনলাম, প্রদীপবাবুর তো বটেই, ওঁর বিজ্ঞান প্রচার সমিতিরও লক্ষ টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। এমন বাজি ধরার ঝুঁকিও সাংঘাতিক। যদি অবধূতজির কীর্তিকলাপ ম্যাজিকই হয়, সেই ম্যাজিক কি প্রদীপবাবুরও জানা? তার মানে, তুমি যে ম্যাজিক ফাঁস করতে চাও, সেই ম্যাজিক তোমারও জানা চাই।"

"প্রদীপবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখুন না! নিশ্চয় ম্যাজিকটা জানেন বলেই বাজি ধরেছেন।"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "তার আগে চলো, এক জায়গায় ঘুরে আসি। সাড়ে নটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।"

"কোথায়? কার সঙ্গে?"

"এন্টালি এলাকায় অজিতপ্রসাদ আগরওয়ালের সঙ্গে।"

"কী ব্যাপার?"

"চলো তো! ষষ্ঠী, বেরুচ্ছি।"

কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের নির্দেশ মতো একটা গলিরাস্তায় পৌঁছে গাড়ি দাঁড় করলাম। অন্যদিক থেকে আর একটা গলি এসে এখান থেকে খানিকটা চওড়া হয়ে সি আই টি রোডে মিশেছে। গোড়া-বাঁধানো বটগাছের তলায় গাড়ি রাখতে বললেন কর্নেল। সামনে একটা পাঁচতলা বাড়ি। খানিকটা জাহাজের গড়ন বাড়িটার মধ্যে স্থাপত্য-কাঠামোর সৌন্দর্য্যআছে, কিন্তু রঙবেরঙ একেবারে কিম্ভূত হয়ে পড়েছে।

বন্ধ গেটের সামনে গেলে দারোয়ান মিলিটারি সেলাম ঠুকল। আমাকে নয়,

কর্নেলকেই। দশাসই সায়েবি চেহারা, ঋষিসুলভ দাড়ি এবং মাথায় সায়েবি টুপি: টুপিপরার কারণ অক্টোবরের তেজী রোদে টাক ঝলসে যাবে। আশেপাশে তত উঁচু বাড়ি নেই এবং বোঝাই যায়, এটা এক সময় বস্তি এলাকা ছিল।

কর্নেল কিছু বলার আগেই দারোয়ান বলল, "আপ কর্নিলসাব ?"

"হাঁ। আগরওয়ালজি হ্যায় ?"

"আইয়ে, আইয়ে! অন্দর আইয়ে!"

আমরা ভেতরে লনে ঢুকলে পোর্টিকোর দিক থেকে একজন রোগা গুঁফো ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। নমস্কার করে বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। বুঝলাম, ইনিই আগরওয়ালজি। চমৎকার বাংলা বলেন। হাবভাবে অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র বলেই মনে হল।

ঘরের ভেতরটাও খুব রঙচঙে। আমাদের বসতে বলে আগরওয়ালজি আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কর্নেল বললেন, "আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি। আপনি বসুন।"

আগরওয়ালজি তবু দাঁড়িয়ে রইলেন বিনীত ভঙ্গিতে।

কর্নেল বললেন, "আপনি না বসলে তো কথা হবে না আগরওয়ালজি!"

এবার বুঝতে পারলাম, এই মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কোনও কারণে শঙ্কিত। দ্বিধার সঙ্গে বসে কাঁচমাচু মুখে হাসলেন। "দেখুন কর্নেলসাব! এই জমি আমি ঠিক-ঠিক দাম দিয়ে সাত বছর আগে কিনেছি। সব পেপার দেখে তবে কিনেছি। রেজিস্টার্ড ডিড, কর্পোরেশন পেপার্স—যা কিছু দেখতে চান, দেখাচ্ছি। এত বছর পরে কেন ঝামেলায় পড়তে হবে, আমি তো বুঝতে পারছি না।"

"চারুলতা সেনের কাছে কিনেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। ডিডের উইটনেস তাঁর ভাই হেমাঙ্গ সেনগুপ্ত। হেমাঙ্গবাবুই দিদির সিগনেচার আইডেন্টিফাই করেছেন।"

"হেমাঙ্গবাবু এখন কোথায় আছেন ?"

"তা তো জানি না। আগে থাকতেন ভবানীপুরে।"

"ডিডে ওঁর অ্যাড্রেস থাকার কথা।"

"হ্যাঁ। আমি আপনাকে ডিড এনে দেখাচ্ছি।"

আগরওয়ালজি ভেতরে গেলে চাপাস্বরে বললাম, "রিস্ক নেওয়া হচ্ছে না ?"

কর্নেল একটু হেসে আস্তে বললেন, "এন্টালি থানাকে বলে রেখেছি। আগরওয়ালজির পক্ষে থানায় ফোন করে জনৈক কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের

আসার ব্যাপারটা পুলিশকে জানানোর চান্স ছিল। ইতিমধ্যে ফোন করেছিলেন সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। আজকাল প্রতারকদের যা কাণ্ডকারখানা, তাতে এমন একজন ঝানু লোকের সতর্ক হয়ে ওঠারই কথা।"

হাসতে গিয়ে সামলে নিলাম। আগরওয়ালজি সম্ভবত কাগজপত্রের ফাইল বের করেই রেখেছিলেন। ব্যস্তভাবে ঘরে ছুটে ফাইল খুলে ডিড বের করলেন। "আপনি দেখুন। ওরিজিন্যাল ডিড আছে। এই দেখুন হেমাঙ্গবাবুর সিগনেচার।"

কর্নেল ঠিকানাটা টুকে নিয়ে বললেন, "চারুলতা দেবীর একটি মেয়ে ছিল। অনামিকা। এই প্রপার্টিতে তার শেয়ার ছিল।"

আগরওয়ালজি চমকে উঠলেন। "সে কী কথা!"

"অনামিকার কথা আপনি জানেন না?"

আগরওয়ালজি একটু হাসলেন। "ঠিক আছে। তাকে নিয়ে আসবেন। যদি সে ঠিক-ঠিক অনামিকা বলে প্রুভ করতে পারে, তার শেয়ার মিটিয়ে দেব।"

"অনামিকার কথা আপনি সত্যিই জানেন না? শোনেন নি কিছু তার সম্পর্কে?"

"একটু-একটু শুনেছি। এই জমি কেনার আগেই শুনেছি। কর্নেল সাব! আমি সবকিছু খবর না নিয়ে জমি কিনিনি।"

"কী শুনেছেন বলুন!"

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জ ছিল। আগরওয়ালজি একটু ইতস্তত করে বললেন, "শুনেছি, অনেক বছর আগে বিয়ের আগের রাতে নাকি তাকে কে কিডন্যাপ করেছিল। তারপর আর তার খবর পাওয়া যায়নি। তবে আপনি তার শেয়ারের কথা বলছেন। আমি নিউজপেপারে অ্যাডভার্টাইজ করেই এই প্রপার্টি কিনেছি। এতদিন পর্যন্ত কেউ শেয়ার ক্লেম করেনি। এখন ক্লেম করলে আমি তাকে আপনার খাতিরে টাকা মিটিয়ে দেব। ঠিক আছে কর্নেলসাব?"

"কে কিডন্যাপ করেছিল, শুনেছেন কি?"

আগরওয়ালজি মাথা নেড়ে বললেন, "তা জানি না। তবে মেয়েটা ভাল ছিল না শুনেছি। আমি ওসব ঝামেলায় থাকি না স্যার! আমি বিজনেসম্যান। বিজনেস ছাড়া কিছু বুঝি না। আপনি ওসব খবর জানতে হলে ওই মোড়ে এক ডাক্তারবাবু আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ধন্যবাদ আগরওয়ালজি!"

লনে এসে আগরওয়ালজি বললেন, "আমি কিছু বুঝতে পারলাম না

কর্নেলসাব ! এ কিসের কেস আছে ?"

"সরি আগরওয়ালজি ! সেটা বলা যাবে না। বাট এগেন থ্যাংকস্ ফর ইওর কো-অপারেশন !"

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে রাস্তায় এলেন। দারোয়ান আবার মিলিটারি সেলাম ঠুকল। লোকটি সম্ভবত মিলিটারিতে সেপাই-টেপাই ছিল।

আগরওয়ালজি বললেন, "ওই দেখুন ডাক্তারবাবুর বাড়ি। চলুন, আমি আলাপ করিয়ে দিই।"

সাইনবোর্ডে লেখা আছে ডাঃ পি কে দত্ত। তার পাশে ইংরেজি বর্ণমালার মিছিল। কিন্তু ঘরে বসে মাছি তাড়াচ্ছেন ডাক্তারবাবু। খটখটে বুড়োমানুষ। আগরওয়ালজি কর্নেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সি বি আই অফিসার শুনেই ডাঃ দত্ত কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আগরওয়ালজি সবিনয়ে বললেন, "কর্নেলসাব ! আমাকে এবার বেরুতে হবে। আমি চলি। যখন দরকার হবে, আসবেন। নমস্তে।"

ডাঃ দত্ত এবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "আপনারা বসুন। বলুন কী ব্যাপার ?"

কর্নেল বললেন, "একটা পুরনো কেসের তদন্তে এসেছি। আপনার সাহায্য চাই ডঃ দত্ত।"

"একশোবার। বলুন, কী সাহায্য করতে পারি ?"

"আপনি অনামিকা সেনকে চিনতেন ?"

ডাঃ দত্ত চমকে উঠলেন। "অনামিকা সেন ?"

"হ্যাঁ। অনামিকা সেন।"

"সে তো অনেকবছর আগের কথা। বাসু নামে পাড়ার একটা ছেলে বিয়ের আগের রাতে তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর পুলিশ কেসও হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে, পুলিশ খুঁজে পায়নি ওদের। বাসু—"

"বৈশম্পায়ন রায় ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই গলিতেই থাকত ওরা। এখন ওদের বাড়িতে একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল হয়েছে। বাসুর বাবা-মাও কবে মারা গেছেন। তা প্রায় বছর বিশেক হয়ে গেল। বাসু নাকি জামসেদপুরে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর আর তার খবর পাওয়া যায়নি। আর অনির—মানে, অনামিকার কথা বলছেন ?" ডাঃ দত্ত স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন, "অনির মায়ের কাছে শুনেছিলাম, অনি একটা চিঠি লিখে জানিয়েছে সে ভাল আছে। তার জন্য চিন্তার কারণ নেই। চিঠিতে ঠিকানা ছিল না।"

"কতদিন আগে, মনে পড়ছে আপনার ?"

"এই তো !" ডাঃ দত্ত আবার একটু ভেবে বললেন, "বছর আষ্টেক হবে বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ—তার পরের বছর অনির মামা ওদের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে অনির মাকে নিয়ে গেল। বোধ করি ভবানীপুরে না কোথায়—"

"ভবানীপুরে অনির মামা থাকতেন, আমরা জানি।"

"তাহলে সেখানেই।"

"অনির মা আপনাকে বলেছিলেন অনি চিঠি লিখেছে ?"

"হ্যাঁ।"

"আট বছর আগে ?"

"হ্যাঁ। আগরওয়ালজি ওদের বাড়িটা কিনলেন, তার আগের বছর।" ডাঃ দত্ত নড়ে বসলেন। "কী কেসের তদন্ত স্যার ?"

"সরি ডঃ দত্ত ! বলা যাবে না। তো আপনি সমীর রুদ্রকে চিনতেন ?"

ডাঃ দত্ত আবার চমকে উঠলেন। টেবিলে পড়ে থাকা দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা দেখিয়ে বললেন, "আজই কাগজে দেখলাম সমীর স্যুইসাইড করেছে। কী সাংঘাতিক কাণ্ড ! এই দেখুন।"

"দেখেছি। আপনি সমীরবাবুকে চিনতেন ?"

"হ্যাঁ। পাড়ারই ছেলে সব। ওই যে গ্যারেজ দেখছেন, তার পাশের বাড়িতে থাকত ওরা। কসবায় ফ্ল্যাট কিনেছে শুনেছিলাম। হঠাৎ আজকের কাগজে এই খবর।"

"আচ্ছা ডঃ দত্ত, বাই এনি চান্স আপনি প্রশান্ত সান্যাল নামে কাকেও চিনতেন ?"

ডাঃ দত্ত তাকালেন। "প্রশান্ত সান্যাল ?"

"হ্যাঁ। প্রশান্ত সান্যাল।"

"বুঝেছি। পরেশের ছেলে। শুনেছি সে তো এখন বিলেতে না কোথায় থাকে। কোটিপতি হয়েছে নাকি।"

"এই পাড়ায় থাকতেন ওঁরা ?"

"বলতে পারেন। আগরওয়ালজির বাড়ির পাশের গলিতে থাকত। প্রশান্তর এক ভাই আছে। স্টেশনারি দোকান করেছে। মহাকালী ভাণ্ডার। ডাকনাম তপু। তাপস। ওর দোকানে গেলে প্রশান্তর খবর পাবেন।"

"থ্যাংকস্ ডঃ দত্ত ! চলি !"

গলিরাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "একটা পুরনো নাটকের ব্যাপার মনে

হচ্ছে। জমেও উঠেছে। কারণ আট বছর আগে অনামিকা সেন তার মাকে চিঠি লিখেছিল। তার মানে—"

কর্নেল বললেন, "তার মানে আট বছর আগে তার অস্তিত্ব ছিল।"

"এখনও আছে। রায়সায়েবকে লেখা লালচিঠির হুমকি সেটা বলে দিচ্ছে।"

"কিছু বলা যায় না, জয়ন্ত! মিঃ রায়ের সন্দেহ, অনামিকাকে কেউ খুন করেছে এবং সে চাইছে না, অনামিকা সম্পর্কে কেউ খোঁজ নিক। খোঁজ নিতে গেলে তার ধরা পড়ার চান্স আছে।"

একটু চমকে উঠলাম। অস্বস্তিতে শরীর ছমছমিয়ে উঠল। গাড়ির কাছে এসে বললাম, "ওই গলির ভেতর গাড়ি ঢোকানো ঠিক হবে?"

"নাহ্। গাড়ি থাক। ওই দেখ, আগরওয়ালজির দারোয়ান নজর রেখেছে।"

"কর্নেল, বাজি রেখে বলতে পারি লোকটা মিলিটারিতে সেপাই ছিল।"

"বাজি রাখার দরকার নেই।"

কর্নেলের সঙ্গে থাকার এটাই মজা। একটু আগের অস্বস্তিটা ঘুচে গেল। হেসে ফেললাম। গলিটা ঘুরে-ঘুরে এগিয়েছে। খানিকটা গিয়ে 'মহাকালী ভাণ্ডার' দেখা গেল। আমাদের খদ্দের ভেবে একজন গাব্দাগোব্দা চেহারার ভদ্রলোক সম্ভাষণ করলেন, "বলুন স্যার!"

কর্নেল বললেন, "আপনি কি তাপসবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কী ব্যাপার?"

"আপনার দাদার নাম প্রশান্ত সান্যাল?"

তাপসবাবু একটু অবাক হলেন যেন। "আপনারা কোত্থেকে আসছেন স্যার?"

কর্নেল মিষ্টি হাসলেন। "প্রশান্তবাবু আমার পরিচিত, অ্যামেরিকায় আলাপ হয়েছিল। কলকাতা আসার কথা বলেছিলেন। এসেছেন কি?"

"না তো!"

"এলে আপনার এখানে ওঠেন?"

"না। থিয়েটার রোডে একটা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছে। সেখানেই ওঠে। তবে কলকাতা এলে একবার দেখা করে যায়, এইমাত্র।"

"বলছিলেন, অক্টোবরে একবার আসবেন কলকাতা।"

তাপসবাবু হাসলেন। "দাদা বছরে একবার মাত্র আসে। পুজোর সময়। এবার পুজো চলে গেল। এল না। প্রায় ছ-সাত বছর হল, আমেরিকায় আছে। প্রত্যেকবছর পুজোয় এসেছে। এবার এল না কেন কে জানে? আপনার সঙ্গে

কতদিন আগে দেখা হয়েছিল স্যার ?"

"গতমাসে। আপনার বউদি—"

"বউদির তাড়াতেই আসে। মেমসায়েব বউদি স্যার, বুঝলেন ? ইন্ডিয়ান কালচারের খুব ভক্ত।"

"আপনার বউদির সঙ্গে আলাপ হয়নি অবশ্যি। আমি ভেবেছিলাম আপনার বউদি কলকাতার মেয়ে। প্রশান্তবাবুর কথা শুনে তা-ই মেন মনে হয়েছিল।"

তাপসবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "মেমসায়েব দাদার সেকেন্ড ওয়াইফ স্যার!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! ফাস্ট ওয়াইফ কলকাতার মেয়ে বলছিলেন। বুঝতে ভুল করেছি।"

"দাদা স্যার বড্ড খেয়ালি লোক।"

"তা-ই বুঝি ?" কর্নেল চুরুট ধরালেন। "আপনার কলকাতার বউদি সম্ভবত মারা যান।"

"হ্যাঁ!"

"অসুখ হয়েছিল বুঝি ?"

"হ্যাঁ!"

"কলকাতায় মারা যান ?"

"তা তো জানি না।" তাপসবাবুর মুখে এতক্ষণে সন্দেহের ছাপ ফুটে উঠল। "আমি স্যার দাদার ফাস্ট ওয়াইফকে দেখিনি। কাজেই বলতে পারব না।"

"আচ্ছা, চলি তাপসবাবু! নমস্কার!"

আমরা কয়েক পা এগিয়ে আসতেই তাপসবাবু সঙ্গ নিলেন। "একটা কথা স্যার! আপনাদের পরিচয় তো দিলেন না ? দাদা আবার কোনও কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েনি তো ?"

কর্নেল হাসলেন। "কেন এ কথা মনে হল আপনার ?"

"আপনারা আই বি কিংবা সি আই ডি অফিসার। তাই না স্যার ?"

"হলেও আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

তাপসবাবু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "আজ কাগজে দেখলাম, দাদার থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে সমীরদা স্যুইসাইড করেছে। সেজন্যই জিজ্ঞেস করছি, স্যার!"

কর্নেল আস্তে বললেন, "আপনার কলকাতার বউদির নাম কী ছিল তাপসবাবু ?"

তাপসবাবুর মুখ সাদা হয়ে গেল। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "শোনা কথা

স্যার ! আমি বউদিকে কখনও দেখিনি । বড় হয়ে শুনেছি । দাদা আমার চেয়ে একুশবছরের বড় স্যার ! আমার বাবার প্রথমপক্ষের ছেলে হল দাদা । আমি স্যার দ্বিতীয় পক্ষের । আমার স্যার—"

"আপনার কলকাতার বউদির নাম ছিল অনামিকা । তাই না ?"

"শুনেছি স্যার ! দাদা বড্ড ঝামেলা করে বেড়াত বলে বাবা ওকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন।"

"থ্যাংকস্, তাপসবাবু ! আপনার চিন্তার কারণ নেই । চলি ।"

গাড়িতে বসে দেখলাম, তাপসবাবু অপটু হাতে আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছেন । গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললাম, "নাহ্ ! তত জমল না । রহস্যের জটগুলো পটাপট্ ছেড়ে যাচ্ছে ।"

কর্নেল বললেন, "একটা থিওরি মাথায় রেখে এগোলে অনেক সুবিধে হয় । বিনা থিওরিতে তথ্য খুঁজে বেড়ানো খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার সামিল, জয়ন্ত ! একটা থিওরি যদি তথ্যের ভিত্তি না পায়, যদি নড়বড় করে, তা হলে দ্বিতীয় থিওরি তৈরি করো ! আবার এগোও ।"

"এবার কোনদিকে এগোব, বলুন ?"

"এলিয়ট রোডে সানি ভিলা ।"

"বাড়ি ফিরে কী লাভ ? চলুন, লেকটাউনে প্রদীপ মিত্রের বাড়ি ঘুরে আসি ।"

"ডার্লিং ! তুমি পরস্ত্রীর প্রেমে পড়ে গেছ !"

"কী আশ্চর্য !"

কর্নেল হাসলেন । "আশ্চর্য তো বটেই । চলো, আগে বাড়ি ফিরে কফি খেয়ে ঘিলু চাঙ্গা করা যাক । তারপর তোমাকে একটা ছোট্ট কাজের দায়িত্ব দেব ।"

তিনতলায় কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় পৌঁছে বললাম, "মিস্ট্রি ইজ সলভ্ড্, বস্ ! মিঃ রায়কে তাঁর অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিন, অনামিকা সেনের কিলার প্রশান্ত সান্যাল ।"

কর্নেল ডোরবেলের সুইচ টিপে বললেন, "বাই দা বাই, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, গতকাল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের মর্নিং ফ্লাইটে পি সান্যালের নামে হংকংয়ের কনফার্মড্ টিকিট ছিল । বাট হি মিস্ড্ দা ফ্লাইট ।"

"তা হলে আর কী ? খেলা শেষ ।"

কর্নেল বললেন, "খেলা শেষ কোথায় ডার্লিং ? এই তো সবে শুরু ।"

ষষ্ঠী দরজা খুলে মুচকি হেসে চাপা স্বরে বলল, "হালদারমশাই এয়েছেন ।"

ড্রয়িং রুমে ঢুকে দেখি, হালদারমশাই সোফায় পা ছড়িয়ে হেলান দিয়েছেন ।

চেহারা উস্কোখুস্কো। চোখ বন্ধ। নাক ডাকছে। ডাকলাম, "হালদারমশাই!"

হালদারমশাই তড়াক করে লাফ দেওয়ার ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর করুণ হাসলেন।

কর্নেল হাঁকলেন, "ষষ্ঠী! শিগগির কফি।" তারপর হালদারমশাইয়ের দিকে ঘুরলেন। "অবধূতজির মাহাত্ম্যদর্শন করে আপনার চেহারায় জ্যোতি আশা করেছিলাম হালদারমশাই!"

হালদারমশাই হাই তুলে বললেন, "খুব টায়ার্ড।"

"কী দেখলেন বলুন?"

হালদারমশাই বুকপকেট থেকে একটা লকেট বের করে কর্নেলকে দিলেন। বললেন, "এইটুকখান লকেট। তার দাম দশ টাকা। আবার কয় কী, সোনার চেন ছাড়া পরন যাইব না।"

"হুঁ! তো মড়ার সিগারেটটানা দেখলেন?"

"মড়া মানে একটা স্কেলিটন! কংকাল।"

"আহা! কংকাল সিগারেট টানল কি না তা-ই বলুন?"

"টানল। তবে—"

"তবে কী?"

"ঠিক বোঝা গেল না কিছু। স্ত্রীলোকের কংকাল। কারণ মা মা বলে ডাকলেন। বললেন, ওঠ তো মা! সিগারেট টানো তো মা! কংকালটা হাত বাড়াইয়া সিগারেট নিল। সাধুবাবা ধরাইয়া দিলেন। কিছু বোঝা গেল না। স্ত্রীলোকের সিগারেট টানা মনঃপূত হইল না।" হালদারমশাই আমার দিকে ঘুরলেন। "আচ্ছা, কন তো জয়ন্তবাবু! এই কাজটা আমাগো কালচার-ট্রাডিশনের অ্যাগেনস্টে না? একটা গণ্ডগোল আছে কোথাও।"

বললাম, "রাত্রে না দিনে দেখলেন?"

"রাত্রে। তখন প্রায় বারোটা। তারপর কীর্তন শুরু হল। আমি রাত দেড়টার ট্রেন ধরলাম। হাওড়ায় পৌঁছতে সকাল সাড়ে নটা। চাকা গড়ায় না এমন একখান ট্রেন!"

কর্নেল লকেটটা আমাকে দিয়ে বললেন, "চিনতে পারছ জয়ন্ত?"

বললাম, "হ্যাঁ। আর্টিস্ট সুমিতবাবুর ঘরে এঁর ছবি দেখেছি।"

"এবং এই লকেট আছে মিঃ রায়ের গলায়।"

লকেটটা কর্নেল নিলেন আমার হাত থেকে। বললেন, "তো হালদারমশাই, আপনি কি অবধূতজির এই লকেট ধারণ করবেন বলেই কিনে এনেছেন?"

হালদারমশাই প্রচণ্ড হাত নেড়ে বললেন, "না কর্নেলস্যার ! এটা আপনাকে দেখানোর জন্য কিনে এনেছি।"

ষষ্ঠী কফি এনে হালদারমশাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসি চাপল। হালদারমশাইকে দেখলে ষষ্ঠীর কেন হাসি পায় জানি না। হালদারমশাই কফির পটের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবলেন। তারপর আপনমনে বললেন, "দুই কাপ খাইছি।" বলে নস্যির কৌটো বের করে নস্যি নিলেন।

ষষ্ঠীর দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে কর্নেল বললেন, "হাঁ করে কী দেখছিস তুই ?"

সঙ্গে সঙ্গে সে কেটে পড়ল। বললাম, "কর্নেল, বরং লকেটটা ষষ্ঠীকে ধারণ করতে দিন।"

হালদারমশাই হাসলেন। "আমি রামকৃষ্ণঠাকুরের ভক্ত। উনি কইছিলেন, একজন লোক বিশ বৎসর সাধনা কইরা অন ফুট নদী পার হওন শিখল। কথা হইল, এক পয়সায় নদী পার হওন যায়। তার জন্য বিশটা বৎসর নষ্ট ! স্কেলিটনের সিগারেট টানা দেখতে দেখতে সেই কথাটা মনে পড়ছিল। হোয়াট ইজ দা মিনিং অব ইট ?"

কর্নেল বললেন, "বিজ্ঞানপ্রচারসমিতির প্রদীপ মিত্র সদলবলে আজ দুপুরের ট্রেনে কাঁটালিয়াঘাট যাচ্ছেন।"

"অ্যাঁ ?" হালদারমশাইয়ের চোখ গোল হয়ে গেল।

"আপনার মনে হচ্ছে না প্রদীপ মিত্র একটা সাংঘাতিক ঝুঁকি নিচ্ছেন ?"

"হঃ !"

আমার আশঙ্কা হচ্ছে, প্রদীপবাবু যদি প্রমাণ করতে পারেনও যে ওটা ম্যাজিক, অবধূতজির চেলারা তা মানবে না। প্রদীপবাবুর ওপর হামলা চালাবে।"

"হুঃ!"

কর্নেল কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "এর আগে প্রদীপবাবু অনেক গডম্যানকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, কাগজে পড়েছি। তবে তাঁদের কলকাতার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের এবং গণমান্য নাগরিকদের উপস্থিতিতে যুদ্ধে ডেকেছেন। কোনও গডম্যান প্রেস ক্লাবে আসতে রাজি হননি। তাঁদের কৈফিয়ত অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। তাঁরা অলৌকিক শক্তি যেখানে-সেখানেই বা দেখাতে আসবেন কেন ? তাঁদের সাধনপীঠে বসেই দেখাবেন। কিন্তু প্রদীপ মিত্র তাতে রাজি হননি। হামলার আশঙ্কা করেছেন। প্রদীপ মিত্রের কৈফিয়তও যুক্তিযুক্ত। অথচ

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, উনি এক গডম্যানের সাধনপীঠে গিয়েই লড়বেন। এটা একটা সাংঘাতিক রিস্ক।"

আমি বললাম, "স্থানীয় পুলিশকে নিশ্চয় জানিয়ে রেখেছেন।"

হালদারমশাই মাথা নাড়লেন। "পুলিশ কিছু করবে না জয়ন্তবাবু! কাঁটালিয়াঘাটে থানার ওসি অবধূতজির ভক্ত। আমার স্বভাব তো জানেন। সব খোঁজ নিয়েছি। লোকাল পলিটিক্যাল মাতব্বররাও ওনার ভক্ত।"

কর্নেল বললেন, "ভোটের রাজনীতির এটাই সাম্প্রতিক হালচাল। যাই হোক, প্রদীপ মিত্র সাংঘাতিক রিস্ক নিচ্ছেন। চিন্তা করুন হালদারমশাই, এক লাখ টাকা বাজি।"

হালদারমশাই সোজা হয়ে বসলেন। "কেউ কোনও কারণে প্রদীপবাবুকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে না তো কর্নেল স্যার? কেউ ওনাকে প্রোভোক করছে না তো?"

"আপনি বুদ্ধিমান, হালদারমশাই! ঠিকই ধরেছেন।"

হালদারমশাই আরেক টিপ নস্যি নিয়ে হাঁচবার চেষ্টা করে বললেন, "হঃ!"

কর্নেল কি তাতিয়ে দিচ্ছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে? চাপা স্বরে এবার বললেন, "আমার হাতে রিলায়েব্‌ল্ সোর্সের খবর আছে,প্রদীপ মিত্র অবধূতজির কিছু গোপন তথ্য জানেন এবং তাঁর পূর্বাশ্রমের কথাও নাকি জানেন। সে সব কথাও তিনি জনসমক্ষে ফাঁস করে দিতে যাচ্ছেন। তাহলেই বুঝুন!"

হালদারমশাই দুই উরুতে দুই হাত রেখে সোজা হয়ে বসে নীচের দিকে দৃষ্টি রাখলেন। এটা ওঁর চিন্তাকুল ভঙ্গি। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মুখে ওঁর এই ভঙ্গিটি বরাবর দেখে আসছি।

কর্নেল ষড়যন্ত্রসংকুল স্বরে বললেন, "আজ সকালে ওঁর [illegible] দেবী এসেছিলেন আমার কাছে। উনিও উদ্বিগ্ন! স্বামীর সেফটির ব্যবস্থা করে দিতে বলছিলেন। আমি ওঁকে বলেছি, স্ত্রীই স্বামীর শক্ত সেফটি। কাজেই চিত্রাদেবীও সম্ভবত স্বামীর সহগামিনী হচ্ছেন।"

হালদারমশাই ঘড়ি দেখে বললেন, "পৌনে বারোটা বাজে। ট্রেন বারোটা কুড়িতে। তবে কাল ছাড়ছিল পৌনে একটায়।"

"গতরাত্রে আপনাকে ফোন করেছিলাম—"

এই পর্যন্ত শুনেই হালদারমশাই উঠে পড়লেন। "আগে এ সব জানলে কাঁটালিয়াঘাটে থেকে যেতাম। ঠিক আছে। কর্নেলস্যার যখন বলছেন, তখন আর কী?" বলে জোরে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম, "ভদ্রলোক রাত্রি জেগে ক্লান্ত হয়ে সদ্য ফিরেছেন। আবার ওঁকে তাতিয়ে দিয়ে সেখানে ফেরত পাঠালেন ?"

কর্নেল হাসলেন। "কী আশ্চর্য ! আমি কি একবারও ওঁকে বলেছি আপনি আবার কাঁটালিয়া ঘাটে চলে যান ? আমি ওঁকে নিছক কিছু খবর জানিয়েছি।"

"এটাই তো প্রভোকেশন !"

"হ্যাঁ। প্রভোকেশন। জয়ন্ত, হালদারমশাই এবং প্রদীপ মিত্রের মধ্যে তা হলে দেখ কী চমৎকার মিল ! যে-কোনও রহস্যভেদে দুজনেই প্রচণ্ড আগ্রহী !"

"ভুলে যাচ্ছেন, আপনিও একজন প্রখ্যাত রহস্যভেদী।"

"বলতে পারো। তবে আমাকে কেউ প্রোভোক করতে পারে না। বিন্দুমাত্র তাতিয়ে দেওয়া চেষ্টা টের পেলে আমি—" কর্নেল হঠাৎ চুপ করলেন। চোখ বুজে হেলান দিয়ে দাড়িতে আঁচড় কাটতে থাকলেন।

বললাম, "আমি চলি, বস্ !"

"তোমাকে একটা ছোট্ট কাজের দায়িত্ব দেব বলেছি, জয়ন্ত ! পালাতে চাইছ কেন ?"

"সরি ! ভুলে গিয়েছিলাম।"

কর্নেল পকেট থেকে খুদে নোটবই বের করে পাতা উল্টে বললেন, "হুঁ, ইন্দরজিৎ সিং। শেক্সপিয়ার সরণির ওই বাড়িতে দোতলার তিন-নম্বর ফ্ল্যাটের ওনার। সিঁড়িতে উঠে বাঁদিকের ফ্ল্যাট। ওঁর ফ্ল্যাট থেকে পাঁচ নম্বর সোজাসুজি চোখে পড়ে।"

"আমাকে কী করতে হবে তা-ই বলুন না !"

[illegible] জেনেছি, মিঃ সিং একজন ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট্। অনেক বিদেশি কাগ[illegible] তিনি লেখালিখি করেন। তুমিও একজন জার্নালিস্ট্। তুমি একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করো।"

"আমার সঙ্গে ওর চেনাজানা নেই। নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে যদিও।"

"আহা, কথাটা শোনো ! তুমি ওঁকে মিট করো। ধরো, তুমি তোমাদের বাংলা কাগজের জন্য সমীর রুদ্র সম্পর্কে একটা অন্তর্তদন্তমূলক স্টোরি করতে চাও। তাই ওঁর সাহায্য দরকার। আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছ তো ?"

"বুঝতে পারছি। কিন্তু যদি ভদ্রলোক আমাকে পাত্তা না দেন ?"

"গিয়ে দেখ না ! পুলিশকে যে সব কথা উনি হয়তো বলতে চাননি, তোমাকে বলতে আপত্তি না-ও করতে পারেন।" কর্নেল আমাকে তাড়া দিলেন। "দেরি কোরো না। দরকার হলে তোমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখাবে। এমন কি এ-ও

বলবে, স্টোরিটা বেরুলে ওঁকেই ক্রেডিট এবং দক্ষিণা দেওয়া হবে।"

"ওঁর ফোন নাম্বার জানেন ? ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যাওয়া উচিত। তা ছাড়া এখন উনি আছেন কি না, সেটাও তো জানা দরকার। গিয়ে যদি দেখি উনি বেরিয়েছেন ?"

"ফোনে ওঁকে পাবে না। কারণ ওঁর ফোন ডেড হয়ে আছে ক'দিন থেকে।"

কিছুক্ষণ পরে সেক্সপিয়ার সরণিতে সেই বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে গেটে গেলাম। দারোয়ান টুলে বসে খৈনি ডলছিল। আমাকে দেখে সে বলে উঠল, "এক মিনিট ঠারিয়ে !" তারপর একটা নতুন এক্সারসাইজ খাতা বগল থেকে বের করে দিল। "কিসিকা সাথ মুলাকাত কারনে যাতা, ইসমে লিখ দিজিয়ে। ডেট, টাইম, আপকা অ্যাড্রেস—সব কুছ লিখনা পড়ে গা।"

বুঝলাম, ফ্ল্যাট-ওনারদের সোসাইটি এবার সতর্ক হয়েছেন। মনে-মনে হাসলাম। চোর পালালে গৃহস্থের বুদ্ধি বাড়ে বলে একটা বাংলা প্রবাদ আছে। কিন্তু এভাবে কি নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব ? ভুল নাম ঠিকানা লিখে যে-কেউ বাড়িতে ঢুকতে পারে। এ মহানগরে শুধু হাতের লেখা দেখে কোনও দুষ্কৃতীকে খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার সামিল।

দারোয়ান আমার লেখার ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'আপ সিং সাবকা সাথ মুলাকাত করনে আয়া ?

ওকে খুশি করার জন্য বললাম, "বাহ্ ! তব তুম তো ইংলিশ ভি জানতা !"

"থোড়াসা।" সে খাতাটি আগের মতো বগলদাবা করল। বলল, "যাইয়ে। সিংসাব অভি বাহারসে আয়া।"

সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাঁদিকে সংকীর্ণ করিডর। তিন নম্বর ফ্ল্যাট থেকে প্রশান্ত সান্যালের পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাট সোজাসুজি দেখা যায়। ডোরবেলের সুইচ টেপার প্রায় মিনিট দুই পরে দরজা একটু ফাঁক হল। এক শিখ ভদ্রলোকের মুখ দেখতে পেলাম। চোখে সানগ্লাস, মাথায় পাগড়ি, মোমদেওয়া গোঁফ, দাড়িতে কালো সুতোর জাল সাঁটা। বললেন, "ইয়েস ?"

খুব ডাঁটিয়াল লোক দেখছি, ঝটপট নিজের পরিচয় দিলাম। আইডেন্টি কার্ড বের করে দেখাতে যাচ্ছি, বললেন, "নাও আই'ম বিজি ! সরি মিস্টার।" তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অপমানিত বোধ করে চলে এলাম। কর্নেলের বাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল, ওই মুখটা কোথায় যেন দেখেছি। ঘরের ভেতর চোখে সানগ্লাস পরেছেন। চোখের অসুখ ? কিন্তু মুখটা যেন চেনা।

কর্নেল আমাকে দেখে বললেন, "তোমাকে খুব আপসেট দেখাচ্ছে ! এনি মিসহ্যাপ, জয়ন্ত ?"

ধপাস করে বসে বললাম, "এভাবে যেখানে-সেখানে আমাকে পাঠাবেন না প্লিজ ! অপমানের একশেষ। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা।"

কর্নেল হাসলেন। "রিপোর্টার হিসেবে তুমি সত্যিই ব্যর্থ, ডার্লিং ! রাগ লজ্জা ভয়, এই তিন থাকতে নয় প্রবচনটা একজন ভাল রিপোর্টারের প্রতি প্রযোজ্য।"

"স্বীকার করছি। কিন্তু একই পেশার লোকেদের মধ্যে ওই প্রবচন খাটে না। লোকটা মন্ত্রী নয়, নেতাটেতা নয়, আমলা নয়। আমি তবু তো ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট। আর ও ব্যাটা ফ্রিল্যান্স করে। তার এই ব্যবহার অদ্ভুত। তা ছাড়া মুখটা চেনা মনে হল।"

"চেনা মনে হল ?"

"হ্যাঁ। কোথায় যেন দেখেছি। তাছাড়া ওই অ্যাকসেন্টে শিখরা ইংরেজি বলে না।"

কর্নেল একটু পরে বললেন, "তা হলে তোমার মিশন ব্যর্থ হয়নি জয়ন্ত !"

অবাক হয়ে বললাম, "তার মানে ?"

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলিয়ে আস্তে বললেন, "ফরগেট ইট।"

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার

বিকেলে ভবানীপুরে গেলাম অনামিকার মামা হেমাঙ্গবাবুর খোঁজে। একটা জরাজীর্ণ বাড়ির ছাদে ছোট্ট ঘরে থাকতেন হেমাঙ্গবাবু। পুরনো এক বাসিন্দা বললেন, "বাউণ্ডুলে লোক ছিলেন স্যার ! দিদিকে ছলেবলে ভুলিয়ে তার বাড়ি বেচে টাকাগুলো মেরে দিয়েছিলেন। তারপর হাওয়া ! আমরা ওঁর দিদিকে সাহায্য করতাম। রোগে ভুগে মারা গিয়েছিলেন। আমরাই ওঁকে হাসপাতালে রেখে এসেছিলাম।"

আরেক ভদ্রলোক সন্দিগ্ধভাবে জানতে চাইলেন, হেমাঙ্গবাবুর বিরুদ্ধে কোনও কেস-টেসের তদন্তে এসেছি নাকি। তাঁকে বললাম, "নাহ্। উনি আমার পরিচিত ছিলেন। এ পাড়ায় একটা কাজে এসেছিলাম। হঠাৎ ওঁর কথা মনে পড়ল। তাই একবার দেখা করার ইচ্ছে ছিল।"

আমার গাড়িটা পুরনো আমলের ল্যান্ডরোভার। পৌরাণিক বীরের মতো স্থিতধী এবং শক্তিমান। কিন্তু কসবায় গৌরী দেবীর ফ্ল্যাটে পৌঁছুতে সাড়ে ছটা বেজে গেল। সারাপথ আজ বড্ড বেশি জ্যাম।

একটি কিশোরী দরজা খুলে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। বললাম, "তুমি নিশ্চয় মিম্মি ?"

সে আরও অবাক হল। "আপনি আমাকে চেনেন ?"

"চিনি তা তো বুঝতেই পারছ।"

"ইমপসিবল ! আমি আপনাকে কখনও দেখিনি। আপনি কি ক্রিশ্চিয়ান ফাদার ?"

"নাহ্ মিম্মি ! খাটি বাঙালি।"

মিম্মি চোখে অবিশ্বাস রেখে বলল, "আপনি কার সঙ্গে দেখা করবেন ?"

"সমীরবাবুর মায়ের সঙ্গে। বলো, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এসেছেন।"

"দিদা এখন শুয়ে আছে।"

"আহা, গিয়ে তুমি বলো ওঁকে।"

মিম্মি আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ভেতরে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল, "ভেতরে এসে বসুন। দিদা আসছে।"

সমীরবাবুর মা গৌরী দেবী এসে নমস্কার করে বললেন, "পুলিশের লাহিড়ি সায়েব আপনার কথা আমাকে বলেছেন। দুপুরে ফোন করেছিলেন।"

"ফোনের লাইন কাটা ছিল শুনেছি ?"

গৌরীদেবী সোফায় বসে বললেন, "হ্যাঁ। নীচের বক্সে তার ছেঁড়া ছিল। মিম্মির দাদা সেরে দিয়েছে।"

বৃদ্ধাকে লক্ষ করছিলাম। অনেকটা সামলে উঠেছেন। তবে কণ্ঠস্বর ভাঙা। আড়ষ্ট। বললাম, "এ অবস্থায় আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো ?"

গৌরীদেবী আস্তে মাথা নাড়লেন। "না। বলুন কী জানতে চান ?"

"আপনারা একসময় এন্টালি এলাকায় থাকতেন ?"

"হ্যাঁ।" একটু ইতস্তত করে গৌরী দেবী বললেন, "প্রশান্ত, বাসু ওরা সব একই পাড়াতে থাকত। দুজনেই সমীরের বন্ধু ছিল।"

"চারুলতা সেনও থাকতেন ?"

"চারু খুব ভাল মেয়ে ছিল। তবে বড্ড বোকা। ওর ভাই এমন সর্বনাশ করবে বুঝতে পারেনি।"

"আপনি ওঁদের বাড়ি বিক্রির কথা বলছেন ?"

"বাড়ি বিক্রি। তারপর চারুর মেয়ে ছিল একটা—অনি। অনিকে নিয়েও ঝামেলা। অনিও ভাল। কিন্তু মায়ের মতো বোকা।"

"অনির সঙ্গে সমীরের বিয়ের ব্যাপারটা বলুন ?"

গৌরীদেবী একটু চুপ করে থেকে বললেন, "চারু আমার হাতে ধরে বলল। এদিকে সমীরেরও ইচ্ছে। কী করব ?"

"বিয়ের আগের রাতে অনিকে বাসুবাবু কিডন্যাপ করে—"

"না, না ! বাসুও ভাল ছেলে। কিডন্যাপ কেন করবে ? অনি পালিয়ে ছিল প্রশান্তর সঙ্গে।"

"আপনি ঠিক জানেন ?"

"জানি মানে আমার তা-ই সন্দেহ হয়েছিল। বাসু তো তখন জামসেদপুরে।"

"সমীরবাবুর মুখে অনি সম্পর্কে কিছু শুনেছেন ?"

"সমীর বলত, অনি বাসুর সঙ্গে পালিয়েছিল। ক'বছর আগে সমীর একদিন বলল, অনি বাসুর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করিনি।" গৌরী দেবী মিম্মিকে বললেন, "লক্ষ্মী দিদি ! কর্নেল সায়েবের জন্য এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করে দে। তোর মাকে গিয়ে বল্।"

বললাম, "না, না। আমি চা খাই না। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।"

গৌরীদেবী তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। মিম্মি ফিক করে হাসল। "কোল্ড ড্রিংক ?"

বললাম, "নাহ্। থ্যাংকস।"

"কফি ?"

"হেসে ফেললাম।"খাব।"

মিম্মি চলে গেল। গৌরী বললেন, "মিম্মি না থাকলে আমার এবার কী যে হত ভেবে পাই না কর্নেলসায়েব ! কোন জন্মে আমার খুব আপন কেউ ছিল মেয়েটা।"

"আচ্ছা, সমীরবাবুর কাছে অনির কোনও ছবি ছিল জানেন ?"

"ছবি ? অনির ছবি ?"

"হ্যাঁ, অনির ছবি। সমীরবাবুর অ্যালবাম নিশ্চয় আছে ?"

"দেখাচ্ছি।" বলে গৌরীদেবী ভেতরে গেলেন। একটু পরে দুটো প্রকাণ্ড অ্যালবাম নিয়ে এলেন।

অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তরুণ সমীরবাবুর পাশে এক তরুণীর ছবি দেখতে পেলাম। ছবিটা দেখিয়ে বললাম,"ইনি কি আপনার বউমা ?"

গৌরী দেবী ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন, "নাহ্ ! অনির ছবি।"

দুটো অ্যালবাম ঘাঁটতে সময় লাগল; মিম্মি কফি আনল। সে আমার পাশে

বসে ছবি দেখতে থাকল। একটা পোস্টকার্ড সাইজ ছবির ওপর আঙুল রেখে সে বলল, "এটা কার ছবি দিদা ?"

আমি বললাম, "অনি নামে একটি মেয়ের।"

"আপনি চেনেন ? কে অনি ?"

গৌরীদেবী দেখে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, অনির ছবি।"

বললাম, "ছবিটা আমার দরকার। একটা প্রিন্ট করিয়ে নিয়ে ফেরত দেব।"

গৌরী বললেন, "নিন না। ফেরত দিতে হবে না। ও ছবি আমি কী করব ?"

ছবিটা বের করে পকেটস্থ করলাম। মিম্মি বলল, "কে অনি, দিদা ?"

"ওকে তুমি চিনবে না ভাই!"

মিম্মি আমার দিকে তাকিয়ে রইল। গৌরী দেবীকে বললাম, "আর একটা কথা। অনির মামাকে আপনি চিনতেন ?"

"কয়েকবার দেখেছি। লোকটা ভাল ছিল না। চারু ভাইকে বিশ্বাস করেই সর্বস্বান্ত হয়েছিল। অনি বলত শকুনিমামা।"

"গতকাল বাসুবাবুকে অনেক বছর পরে দেখলেন। চিনতে পেরেছিলেন ?"

"প্রথমে চিনতে পারিনি'। পরে চিনলাম। বাসু খুব ভাল ছেলে। বাসু আমাকে বলল, প্রশান্তের জন্যই নাকি সমীর স্যুইসাইড করেছে। কেন এ কথা বলল জানি না। জিজ্ঞেস করার মতো মনের অবস্থা ছিল না।"

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। "চলি! দরকার হলে আবার আসব। বিরক্ত হবেন না তো ?"

গৌরীদেবী উঠে এসে দরজা খুলে দিয়ে আস্তে বললেন, "কর্নেলসায়েব! সমু কি সত্যি স্যুইসাইড করেছে ?"

"কেন ? আপনার কি মনে হচ্ছে ওঁকে কেউ খুন করেছে ?"

গৌরীদেবী দ্বিধাজড়িত ভঙ্গিতে বললেন, "কে জানে! আমার সন্দেহ হচ্ছে। সমু পিস্তল কোথায় পাবে ?

"পিস্তল নয়, রিভলবার।"

"একই কথা। কর্নেলসায়েব! ইদানীং সমুর হাবভাব যেন বদলে গিয়েছিল। আমার ছেলেকে আমি ছাড়া কে বেশি চিনবে ? সমু কেন যেন খুব ভয়ে-ভয়ে থাকত। প্রায়ই বলত, কেউ তার খোঁজে এসেছিল কি না। আরও সব কথাবার্তা—ঠিক মনে করতে পারছি না।"

মিম্মি বলল, "সমুকাকু স্যুইসাইড করেনি।"

বললাম, "কেন বলো তো ?"

"সমুকাকু স্যুইসাইড করলে কিছু লিখে রাখত। কোনও কিছু না লিখে কেউ আজকাল স্যুইসাইড করে না। বাবা বলছিল।"

চুপচাপ চলে এলাম। সারাপথ আমাকে একটা চিন্তা অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

ড্রয়িং রুমে বসে অনির ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। এই ছবিটা স্পষ্ট। অসামান্য সৌন্দর্য বললে কিছু বোঝায় না। এমন কোনও মেয়ে এই ধুলোমাটির জগতে যেন এক অমর্ত্য মায়া। একে নিয়ে তিন যুবকের লড়াই বাধতেই পারে।

রাত আটটায় চিত্রকর সুমিতবাবুকে ফোন করলাম। "সুমিতবাবু! আপনার আঁকা কতদূর এগোল?"

"মর্নিংয়ে পেয়ে যাবেন।"

"সুমিতবাবু! ছবিটার দরকার হবে না। অকারণ আপনাকে পরিশ্রম করিয়েছি। ক্ষমা চাইছি।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। আমি একটা ছবি পেয়ে গেছি। তাতেই কাজ হবে।"

"ঠিক আছে। তবে ছবিটা আমি শেষ করব। আমার স্টুডিওতে থাকবে। যে ছবি পেয়েছেন, মিলিয়ে নিতে পারেন। আমার ধারণা, আপনি অবাক হবেন।"

"অবাক নিশ্চয় হব। তবে আপনি ছবিটা স্টুডিওতেই রাখবেন।"

সুমিতবাবু নিশ্চয় নিরাশ হলেন। কী আর করা যাবে? ভাল নিখুঁত ফোটো যখন পেয়ে গেছি, তখন হাতে আঁকা ছবির দরকার নেই।

আধঘন্টা পরে অরিজিতের টেলিফোন এল। "হাই ওল্ড বস্! দা মিস্ট্রি ইজ সলভ্ড্।"

"কী ভাবে?"

"প্রশান্ত সান্যাল মার্ডারার। গত ২৩ সেপ্টেম্বর সে কলকাতা এসেছিল। দমদম এয়ারপোর্টের পেপার্স থেকে সেটা জানা গেছে।"

"অরিজিৎ! দেশে আরও ইন্টার ন্যাশন্যাল ফ্লাইটের জন্য এয়ারপোর্ট আছে। বোম্বে এবং দিল্লির কথাই বলছি।"

একটু পরে অরিজিৎ বলল, "হ্যালো! আর য়ু দেয়ার?"

"ইয়া।"

"আমরা বোম্বে-দিল্লিতে খোঁজ নিচ্ছি। তবে প্রশান্ত সান্যাল যে কিলার, এটা সিওর।"

"ছাড়ছি ডার্লিং!"

ফোন রেখে আবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। পঁচিশ বছর আগের একটা চলচ্চিত্র। কোথাও-কোথাও অস্পষ্ট। তবু অনুমান করা যায় ঘটনাবলি।

রাত নটায় ফোন করলাম বৈশম্পায়ন রায়কে। ফ্ল্যাটে কেউ নেই। অনেকক্ষণ রিং হল। ফোন রেখে দিলাম। প্রথম দিন বাসুবাবুকে দেখে মনে হয়েছিল, ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা আছে। কেন এই উত্তেজনা এবং তাগিদ এতদিন পরে ? পঁচিশ বছর আগের চলচ্চিত্রে অস্পষ্ট জায়গাগুলো অনুমান করছিলাম। সমীর রুদ্রের সঙ্গে অনির বিয়ের কথা পাকা হয়েছিল। হঠাৎ আগের রাতে অনি নিখোঁজ হয়ে যায়। সতের বছর পরে অনিকে প্রশান্ত সান্যালের স্ত্রীর ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছি। তারপর অনির মৃত্যু হয়েছিল। প্রশান্ত পাড়ি জমালেন অ্যামেরিকায়। ভয় পেয়ে পালিয়ে যাননি তো বিদেশে ?

ষষ্ঠী এসে বলল, "বাবামশাই, খেতে দেরি হচ্ছে। আমার ঘুম পাচ্ছে খুব।"

বললাম, "টেবিলে খাবার রেখে তুই খেয়ে নে। নাক ডাকিয়ে ঘুমো।"

ষষ্ঠী বেজার হয়ে চলে গেল।

আবার চোখ বুজে চলচ্চিত্রটি দেখতে থাকলাম। অনির জীবনের সতেরটা বছরে অনেকগুলো সিকোয়েন্স থাকা সম্ভব। এই অংশটা একেবারে সাদা হয়ে আছে। তার মৃত্যু কি স্বাভাবিক মৃত্যু ? এই প্রশ্নের জবাবটা এই কেসে সবচেয়ে জরুরি।

ফোন বাজল আবার। বিরক্তিকর। সাড়া দিয়ে বললাম, "কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।"

তারপর হালদারমশাইয়ের কথা ভেসে এল। "কর্নেল স্যার! আইজ প্রোগ্রাম পোস্টপনড্।"

"কিসের প্রোগ্রাম হালদারমশাই ?"

"কম্পিটিশনের। অবধূতজি কইয়া দিছেন আগামীকাইল অমাবস্যা। অমাবস্যার রাত্রে স্কেলিটন সিগারেট টানবে।"

"আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন ?"

"কাঁটালিয়াঘাট থানা থেইক্যা।"

"বড়বাবুর সঙ্গে ভাব জমিয়েছেন মনে হচ্ছে ?"

"কী কইলেন ? জোরে কন্ এট্টু। বড্ড ডিসটার্ব করছে।"

"উইশ যু গুড লাক।"

"কর্নেলস্যার! আপনি জয়ন্তবাবুরে লইয়া আয়েন। ওনারে কইবেন, সব কাগজ থেইক্যা রিপোর্টার সঙ্গে লইয়া আইছেন প্রদীপবাবু। প্রচুর রহইস্য

কর্নেলস্যার !"

"উইশ য়ু গুড লাক।"

"কী কইলেন ? হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—"

লাইনটা কেটে গেল। জয়ন্তের ফ্ল্যাটে ফোন করলাম। জয়ন্ত সাড়া দিল। "রং নাম্বার !"

"এগেন রাইট নাম্বান ডার্লিং !"

জয়ন্তের হাসি শুনলাম। সে বলল, "হঠাৎ রাতদুপুরে হামলার কারণ কী বস্ ?"

"কাঁটালিয়াঘাটে তোমাদের কাগজের কেউ গেছে জানো ?"

"আমি যাইনি।"

"তুমি যাওনি, তা তো বোঝা যাচ্ছে। কাকেও কি পাঠানো হয়েছে ?"

"নাহ্। সত্যসেবক এ সব ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড নয়। তা ছাড়া জেলার সফরে আমাদের স্থানীয় সংবাদদাতা আছে।"

"শোনো। এইমাত্র হালদারমশাই ট্রাংককল করেছিলেন। আগামীকাল অমাবস্যা তিথি। কাজেই লড়াইটা হবে আগামীকাল। সব কাগজ থেকে রিপোর্টার গেছেন। সম্ভবত প্রদীপ মিত্র পাবলিসিটি চান।"

"আমাদের কাগজ গ্রাম-টাম এ সব ফালতু ব্যাপারে ইনটারেস্টেড নয়।"

"তুমি সকাল-সকাল চলে এসো।"

"আপনি কাঁটালিয়াঘাট যাবেন নাকি ?"

"জানি না। তুমি অবশ্যই এসো। রাখছি। হ্যাভ আ নাইস স্লিপ, ডার্লিং !"

"গুড নাইট ওল্ড বস !"...

আজ রাতে নিজের মনের চাঞ্চল্য দেখে নিজেরই অবাক লাগছিল। টেলিফোন করার জন্য আমার অদ্ভুত ব্যগ্রতা। আবার বৈশম্পায়ন রায়কে রিং করলাম। অনেকক্ষণ রিং হল। কেউ সাড়া দিল না। হঠাৎ কোনও জরুরি কাজে বাইরে গেছেন সম্ভবত। নাকি তাঁর কোনও বিপদ হল ?

অরিজিতের বাড়িতে রিং করলাম। সাড়া পেলাম। বললাম, "এত রাতে একটু জ্বালাতে হল। সরি ডার্লিং !"

অরিজিৎ বলল, "এনিথিং রং কর্নেল ?"

"অরিজিৎ ! তোমার বন্ধু মিঃ রায়কে ফোনে পাচ্ছি না। রিং হচ্ছে। কেউ ধরছে না।"

"হয়তো বাইরে গেছে। আমি ওকে বলে দিয়েছি, দা মিস্ট্রি ইজ সলভ্ড্।

তুমি এ নিয়ে আর চিন্তা কোরো না। আমরা প্রশান্তকে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য হাই লেবেলে অ্যাপ্রোচ করছি।"

"অরিজিৎ! লেকটাউন থানাকে বলো, এখনই মিঃ রায়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ নিক।"

"আই সি!"

"ইট ইজ আর্জেন্ট, ডার্লিং। কী হল আমাকে জানাবে।"

ফোন রেখে চুরুট ধরালাম। ষষ্ঠী আবার এসে ডাকল, "বাবামশাই!"

"তুই এখনও জেগে আছিস হতভাগা? তোকে বললাম—"

"অনুগ্র করে আগে খেয়ে নিন।"

ষষ্ঠী বরাবর এরকম করে। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হল, মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে একটা সম্পর্ক, এটা নিশ্চয় কোনও মহত্তর মূল্যবোধের ব্যাপার। এইজন্যই কি মানুষ এখনও চমৎকার টিকে আছে পৃথিবীতে?

খাওয়ার পর আবার ড্রয়িরুমে গেলাম। অরিজিতের ফোনের প্রতীক্ষা করছিলাম। ফোন এল রাত সাড়ে এগারোটায়। অরিজিৎ বলল, "বাসুর পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকের কাছে জানা গেছে, বাসু বাইরে গেছে। ওঁকে বলে গেছে। আগামী পরশু-তরশু ফিরবে। ডোন্ট ওয়ারি বস! এবার শুয়ে পড়ুন।"

"আর একটা রিকোয়েস্ট।"

"বলুন।"

"শেক্সপিয়ার সরণির ফ্ল্যাটের তিন নম্বরের ওনার ইন্দরজিৎ সিংকে মিট করতে বলো পার্ক স্ট্রিট থানাকে। এ-ও আর্জেন্ট। তুমি বলছিলে ওঁর ফোন খারাপ হয়ে আছে—"

"কর্নেল! প্লিজ—আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।"

"অরিজিৎ! তুমিই আমাকে আসরে নামিয়েছ।"

"বাট দা গেম ইজ ওভার, কর্নেল!"

"না অরিজিৎ! এতক্ষণে খেলার শুরু।"

"বলেন কী?"

"ইন্দরজিৎকে এখনই মিট করা জরুরি।"

ফোন রেখে আবার অনামিকার ফোটোটা দেখতে থাকলাম। আবার সেই পুরনো বিবর্ণ চলচ্চিত্র ভেসে উঠল।

রাত বারোটায় অরিজিৎ ফোনে জানাল, ইন্দরজিৎ সিং বাইরে গেছেন। দারোয়ানকে বলে গেছেন, বোম্বে যাচ্ছেন। ফিরতে দেরি হবে।

তা হলে সত্যিই কি আমি মরীচিকার দিকে দৌড়ে চলেছি ?··

জয়ন্ত চৌধুরি

আমার ফ্রেন্ড-ফিলজফার-গাইড কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের মাথায় একটা কিছু ঢুকলে আর ছাড়াছাড়ি নেই। একবার নিছক একটা পাখির পেছনে ছোটাছুটি করে সারাদিন না-খাওয়া না-দাওয়া কাটাতে দেখেছি। জায়গাটা ছিল গহন জঙ্গল। বাঘ-ভালুক ছিল প্রচুর।

আমার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। গিয়ে দেখি, একটু আগে উনি বেরিয়ে গেছেন। ষষ্ঠী বলল, "বাবামশাই বলে গেছেন, কাগজের দাদাবাবু এলে অপিখ্যে করতে বলিস।"

"তুমি অপিখ্যে করছ! ভাল কথা। আমি এবার অপিখ্যে করি।"

ষষ্ঠীচরণ খি খি করে হাসল। "দাদাবাবু! তা-ই করুন। এই ফাঁকে আমি বাজার করে আসি।"

সে চলে গেল বাজারের থলি-হাতে।

ন্যাশানাল জিওগ্র্যাফিক আমার প্রিয় পত্রিকা। কত অদ্ভুত-অদ্ভুত জায়গা আর তাজ্জব ঘটনার খবর দেয় পত্রিকাটি। সাহারা মরুভূমির বাসিন্দা তুয়ারেজ উপজাতির সচিত্র বিবরণে মন দিলাম। ষষ্ঠী মিনিটকুড়ি পরে ফিরল। সে আমাকে কফি আর স্ন্যাক্স পরিবেশন করল। কফিটা অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, ডোরবেল বাজল। কর্নেল ফিরলেন।

বললাম, "আপনার অপিখ্যে করছি।"

কর্নেল হাসলেন না। মুখটা গম্ভীর। ইজিচেয়ারে বসে চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন, "আর্টিস্ট সুমিতবাবু ফোন করেছিলেন। ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনি একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।"

কর্নেল চুপ করলে বললাম, "অবধূতজির মিরাক্‌ল্‌?"

"কে জানে? চুরি।"

"চুরি? মানে, সুমিতবাবুর বাড়িতে চুরি? কী চুরি হয়েছে?"

"সেই ছবির একটা রি-টাচ করা ফোটোকপি।"

"কী করে চুরি গেল?"

"সুমিতবাবুও খুব অবাক হয়েছেন। ছবিটা দেয়ালে সাঁটা ছিল। নেই। পাশে ইজেলে ওটা দেখেই ছবি আঁকছিলেন। ওঁর আঁকা ছবিতে ধ্যাবড়া করে কেউ রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। ছবিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।"

"তা হলে মিঃ রায়ের দেওয়া ফোটোটা চুরি গেছে বলুন।"

"সেটা ওরিজিন্যাল। সুমিতবাবু ওটা থেকে একটা ফোটোগ্রাফি তৈরি করে নিয়েছিলেন। ওরিজিন্যাল ছবিটা অবশ্য আছে।"

"একটু সহজ ভাষায় বলুন না!"

কর্নেল একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, "সহজ ভাষায় বলেছি, ডার্লিং! আসলে আমার মাথার ভেতর কী একটা হয়েছে গতরাত থেকে। হ্যাঁ, মিঃ রায়ের ছবিটা আছে। কেন আছে, বোঝা যায়। এই ছবিটা ছিল ডার্করুমে অনেক ছবির তলায়। চোর সময় পায়নি খোঁজার। কিন্তু এই ছবি থেকে ফোটো তুলে রিটাচ করে যে দ্বিতীয় ফোটো তৈরি করেছিলেন সুমিতবাবু, সেটা দেখেই ছবি আঁকছিলেন। দ্বিতীয় ফোটোটা নেই। এ দিকে আঁকা ছবিটায় লাল-কালো রঙ মাখিয়ে দিয়ে গেছে চোর।"

"বুঝতে পারলাম। কিন্তু স্টুডিওতে চোর ঢুকল কী করে?"

"সুমিতবাবু বললেন, অন্যমনস্কতার ফলে স্টুডিওর দরজা খোলা ছিল সম্ভবত। আসলে শিল্পীরা বড় অন্যমনস্ক থাকেন। জয়িতা—ওঁর বোন কাঁটালিয়াঘাটে গুরুদেবকে দর্শন করতে গেছেন গতকাল। জয়িতাই রাত্রে দরজা বন্ধ আছে কি না চেক করেন। কারণ উনি খামখেয়ালি দাদার স্বভাব জানেন।" কর্নেল চোখ বুজে হেলান দিলেন। "কিন্তু আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার হল, কাল সন্ধ্যায় এক শিখ ভদ্রলোক গিয়েছিলেন ছবি কিনতে।"

"চমকে উঠে বললাম, "ইন্দরজিৎ নন তো?"

"তা বলা কঠিন। ইন্দরজিৎ গতকাল বোম্বে গেছেন।"

"যা-ই বলুন, ইন্দরজিৎ মিসটিরিয়াস ক্যারেকটার।"

"তুমি ওঁর ওপর এখনও রেগে আছ, জয়ন্ত!"

ষষ্ঠী কফি আনল 'বাবামশাইয়ে'র জন্য। উনি চোখ বুজে আছেন দেখে বলল, "কফি বাবামশাই!"

কর্নেল চোখ খুলে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। বললেন, "এগারোটার মধ্যে আমরা খেয়ে নেব। মনে আছে তো?"

ষষ্ঠী বলল, "মনে আছে। দাদাবাবুও খাবেন।"

সে চলে গেলে বললাম, "এত সকাল-সকাল খেয়ে কোথায় যাবেন?"

"কাঁটালিয়াঘাট। তুমিও যাবে।"

"কী সর্বনাশ!"

কর্নেল আস্তে বললেন, "হ্যাঁ, একটা সর্বনাশের আশঙ্কা আমিও করছি,

জয়ন্ত ! তবে তৈরি থাকো। তোমার কাগজের জন্য একটা চমৎকার স্টোরি পাবে।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "স্টোরির কথা পরে। কিন্তু শিখ ভদ্রলোক কী ছবি কিনতে গিয়েছিলেন ?"

"যে-কোনও ছবি। উনি নাকি সুমিতবাবুর ভক্ত।"

"ছবি কিনেছেন ?"

"একটা ছবির দরদাম করে এসেছেন।" কর্নেল কফিতে চুমুক দিলেন। "আমি ন্যায়শাস্ত্রের অবভাসতত্ত্ব আওড়াই। সবসময় দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না—এও বলি। কিন্তু ব্যাপারটা হয়তো কাকতালীয় নয়।"

"তার মানে, ইন্দরজিৎ সিংহই গিয়েছিলেন।"

"ওই তো বললাম, এটা বলা কঠিন। কিন্তু প্রশ্ন হল, কে চাইছে না অনামিকার ছবি আঁকা হোক ? সে কে ? কেন সে—"

কর্নেল হঠাৎ চুপ করলেন। বললাম, "শিখ ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দেননি ?"

"নিজেকে ইন্দরজিৎ বলেননি, এটা সুমিতবাবুর মনে আছে।"

"অনামিকার ছবিটা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেননি ?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "নাহ। তোমকে বলেছি জয়ন্ত, উনি শুধু একটা ছবি কিনতে গিয়েছিলেন। যে ছবিটা ওঁর পছন্দ হয়েছিল, সেটা এক মৃত ব্যবসায়ীর পোর্ট্রেট। তাঁর ছেলেরা বাবার ছবি দেখে চটে গিয়েছিল। নেয়নি। ছবিটা আমি দেখলাম। পোর্ট্রেট হিসেবে অসাধারণ। কিন্তু দেখলেই কেমন নিষ্ঠুর খুনী মানুষের মুখ মনে হয়। হ্যাঁ, মুখ দেখে মানুষের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় না। এ-ও ঠিক।"

কর্নেল চুপচাপ কফির পেয়ালা শেষ করে নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। বললাম, "আপনি তো অনেক সময় ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে রহস্য নিয়ে হাঁটেন। ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা নিয়ে আসা উচিত ছিল। কিছু বলা যায় না। ওঁর ছবি কিনতেই বা কেন আগ্রহ হল শিখ ভদ্রলোকের ?"

"জয়ন্ত ! লাল হেরিং মাছের পেছনে ছোটা আর মরীচিকার দিকে ছোটা একই ব্যাপার।" বলে হঠাৎ একটু উত্তেজিত হলেন কর্নেল। "ডার্লিং ! জীবনে আমাকে কেউ বোকা বানাতে পারেনি। এই প্রথম আমাকে বোকা বানাতে চাইছে কেউ। এ যেন আমার সঙ্গে অঘোষিত যুদ্ধ !"

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁকলেন, "ষষ্ঠী !"

ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ি এলেন। " জয়ন্তবাবু যে! গুরুশিষ্য দুজনেই এত গম্ভীর। কী ব্যাপার?"

আমি কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "সুমিত গুপ্ত ফোন করেছিলেন তোমাকে?"

অরিজিৎ হাসলেন। "আপনার এ প্রশ্নে অবাক হচ্ছি না।"

"ফোন করেছিলেন সুমিতবাবু?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয়, প্রশান্তেরই কীর্তি। যে এখনও কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে পারেনি।"

"কিন্তু অরিজিৎ, প্রশান্ত সান্যাল কেন অনামিকার ছবি নষ্ট করবেন কিংবা রিটাচ করা ফোটো চুরি করবেন?"

অরিজিৎ মিটিমিটি হেসে বললেন, "য়ু নো দা পোলিস নেটওয়ার্ক। প্রশান্তের ভাই তাপসকে জেরা করে জানা গেছে, প্রশান্তই অনামিকা সেনকে এলোপ করেছিল। তাকে সাহায্য করেছিলেন অনামিকার মামা হেমাঙ্গ সেনগুপ্ত। সমীরবাবুকে ভদ্রলোক অপছন্দ করতেন।"

কর্নেল বললেন, "আমি বলছি। অনামিকাকে বিয়ে করলে হেমাঙ্গবাবু দিদির বাড়ি বেচে টাকা আত্মসাতের সুযোগ পেতেন না। সমীরবাবু বাধা দিতেন। তাই হেমাঙ্গবাবু নিজের ভাগনি এবং প্রশান্তকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর কিডন্যাপ কেস সাজিয়েছিলেন প্রশান্ত এবং বাসুবাবু দুজনেরই নামে। আমার এই থিওরি।"

"কারেক্ট।" অরিজিৎ জোর দিয়ে বললেন। "এন্টালি থানার পুরনো রেকর্ডে দুজনের নামেই এফ আই আর করার হদিস মিলেছে। অবশ্য বাসু নির্দোষ। কারণ ওইসময় সে সত্যি জামসেদপুরে ছিল। এদিকে প্রশান্ত অনামিকাকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। আটবছর আগে অনামিকা—"

"অনামিকা তার মাকে চিঠি লিখে জানায়, সে ভাল আছে।"

"আপনার তদন্তের এই অংশ ঠিক আছে।"

"কোন অংশ ঠিক নেই?"

"আপনি প্রশান্তকে ক্লিন সার্টিফিকেট দিচ্ছেন।"

"আমি কাউকে কোনও সার্টিফিকেট দিইনি, অরিজিৎ!"

অরিজিৎ ঘড়ি দেখে বললেন, "কফি খাব না। উঠি।"

"অনামিকা সেন ওয়জ মার্ডার্ড, অরিজিৎ!"

অরিজিৎ তাকালেন।

"হ্যাঁ। আট বা সাত বছর আগের ফেরারি আসামীর রেকর্ড খুঁজে দেখা দরকার।"

অরিজিৎ হাসলেন। "অলরেডি খোঁজা হচ্ছে।"

"বধূহত্যা সংক্রান্ত রেকর্ড খুঁজে দেখ।"

অরিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "কর্নেল! পুলিশ তত ফুলিশ নয়, য়ু নো দ্যাট। লোকে বলে, পুলিশ ইচ্ছে করলে অনেক কিছু পারে। করে না। দ্যাটস্ রাইট। তবে ক্ষেত্র বিশেষে পুলিশ কী অসাধ্য সাধন করে,আশা করি জানেন।"

অরিজিৎ দরজার কাছে গেছেন, কর্নেল বললেন, "অরিজিৎ! আমরা আজ দুপুরের ট্রেনে কাঁটালিয়াঘাটে অবধূতদর্শনে যাচ্ছি।"

"অবধূত দর্শন! হোয়াটস্ দ্যাট?"

"দ্যাটস্ দ্যাট, ডার্লিং!"

অরিজিৎ লাহিড়ি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল বললেন, "আজ অমাবস্যার রাত্রে কালীপুজোর ধুমও দেখব। শুনেছি, কাঁটালিয়াঘাটের শ্মশানকালী জাগ্রত দেবী। তবে অবধূতজি একটা নব—সরি, নারীকংকালের মুখে সিগারেট টানা দেখাবেন। তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে গেছেন বিজ্ঞানপ্রচারসমিতির প্রদীপ মিত্র। খুব জমজমাট লড়াই হবে।"

অরিজিৎ হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

বললাম, "লাহিড়িসায়েব ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলেন না!"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "অরিজিৎ ইজ চেজিং আফটার আ রেড হেরিং। আমারই মতো। তবে আমি এখন সেটা টের পেয়েছি। ও পায়নি।"

একটু অবাক হয়ে বললাম, "অনামিকা খুন হয়েছে বললেন আপনি। বধূহত্যার পুরনো রেকর্ড খুঁজতে বললেন। এখন বলছেন, লাল হেরিংয়ের পেছনে দৌড়ুচ্ছেন লাহিড়িসায়েব। আপনার এই এক অদ্ভুত স্বভাব বস্! হেঁয়ালি করা!"

"হ্যাঁ। হেঁয়ালি বলেই হেঁয়ালি করছি।"

বলে কর্নেল ড্রয়ার থেকে একটা ছবি বের করে আমার হাতে দিলেন। উনিশকুড়ি বছর বয়সের এক অসামান্য সুন্দরী তরুণীর ফোটো। বললাম, "কার ছবি?"

"অনামিকা সেনের। সমীরবাবুর অ্যালবাম থেকে চেয়ে এনেছি।"

"তা হলে সুমিতবাবুর স্টুডিওর চোর বোকা বনে গেল।"

"তা তো গেলই।"

"ভি রায়ের দেওয়া ছবিটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। দিন তো!"

কর্নেল ড্রয়ার থেকে খামে ভরা ছবিটা বের করে দিলেন। মেলাতে গিয়ে মনে হল, দুটো ছবি কিছুতেই একজনের নয়। বললাম, "কর্নেল! আপনার ভুল হয়েছে। এ দুটো ছবি একজনের হতে পারে না।"

"একটা অস্পষ্ট বে-রঙা ছবি। অন্যটা অক্ষত ছবি। কাজেই মিল হবে না। তাছাড়া সব ফোটোতে দেখবে, একই মানুষের ছবি একেকরকম। আলোর ত্রুটি, নেগেটিভ ডেভালাপের ত্রুটি, প্রিন্টের ত্রুটি, রিটাচ করার ত্রুটি—অসংখ্য ত্রুটি এর কারণ।"

"তা ঠিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বড্ড বেশি গরমিল।"-

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে তারপর দাড়ি মুঠোয় ধরলেন। আস্তে বললেন, "মিঃ রায়ের দেওয়া ছবিতে কোনও কেমিক্যাল জিনিস দৈবাৎ পড়ে গিয়েছিল। ছবিটা অক্ষত থাকার কথা। কিন্তু যেন কোনও অ্যাকসিডেন্টে নষ্ট হয়ে গেছে।"

টেলিফোনে রিং হল। আমি টেলিফোনের কাছে। তাই সাড়া দিলাম। একটি মেয়ের গলা ভেসে এল। "কর্নেলদাদু?"

বললাম, "ধরুন দিচ্ছি।"

কর্নেল ফোন নিয়ে বললেন, "বলছি।... ও! তুমি মিম্মি? কী ব্যাপার?... বলো কী! তা হলে তো চোর লোকটি সাধু!... সাধু নয়? হাঃ হাঃ হাঃ!...না, না! ব্যাগ নিয়ে আসার দরকার নেই। আমিই যাচ্ছি। এখনই যাচ্ছি।"

কর্নেল ফোন রেখে উঠে দাঁড়ালেন। বললাম, "কী ব্যাপার?"

"ব্যাপার বুঝতে তোমার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। চলো, ঘুরে আসি।"

"বুঝেছি। কসবায় সমীরবাবুর ফ্ল্যাট থেকে যে হ্যান্ডব্যাগটা চুরি গিয়েছিল, চোর সেটা ফেরত দিয়েছে।"...

কসবায় সমীরবাবুর ফ্ল্যাট কোথায় আমি জানি না। কর্নেলের নির্দেশ অনুসারে ড্রাইভ করছিলাম। শেষপর্যন্ত যেখানে কর্নেল থামতে বললেন, সেটা সংকীর্ণ রাস্তা। একটা পুকুরের পাশে বাড়িটা। গেটের ভেতর একচিলতে ফুলবাগিচা। বারো-তের বছরের একটি মেয়ে গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেলকে দেখে সে হইচই শুরু করল। গেটের ভেতর একটা পাতাবাহারের ঝোপ দেখিয়ে বলল, "এখানে! এই গাছটার ভেতর পড়ে ছিল। দিদা দেখতে পায়নি। আমি দেখতে পেয়েছি।"

সে আমাদের দোতলায় নিয়ে গেল। এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্যালকনিতে। কর্নেল তাঁকে নমস্কার করলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সমীরবাবুর মা গৌরী দেবী।

ঘরে ঢুকে আমরা বসতে না বসতে কিশোরী মেয়েটি একটা ছোট্ট হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এল। কর্নেল ব্যাগটা খুলে ভেতরটা দেখে বললেন, "কিছু নেই দেখছি। খালি ব্যাগ ফেলে দিয়ে গেছে চোর। মিম্মি! তুমি ঠিকই বলছিলে। চোর লোকটি সাধু নয়।"

মিম্মি হাসল। "পাঁচিল গলিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। কিন্তু আপনি ভেতরকার চেনটা খুলে দেখুন!" বলে সে নিজেই চেন খুলে একটা ময়লা ভাঁজকরা কাগজ বের করে দিল।

কর্নেল সেটা খুলে পড়ার পর আমাকে দিলেন। দেখি, মেয়েলি ছাঁদে লেখা একটা চিঠি। প্রেমপত্র নাকি?

'সমীরদা,

বিপদে পড়ে এই চিঠিটা লিখছি। প্রশান্ত আমাকে আটকে রেখেছে। ওর পোষা গুণ্ডারা সবসময় আমাকে পাহারা দেয়। তুমি পুলিশকে জানালে ওরা টের পাবে। তা হলে আমাকে মেরেই ফেলবে। তুমি গোপনে এসে আমাকে যে-ভাবে পারো, এখান থেকে নিয়ে যাও। তোমারও তো দলবল আছে। তুমি ছাড়া আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি যেমন ভুল করেছি, তেমনি তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমার শকুনিমামাই ষড়যন্ত্র করে আমাকে প্রশান্তের হাতে তুলে দিয়েছিল। বিশ্বাসী একটা লোকের হাতে চিঠিটা পাঠালাম। সাক্ষাতে সব বলব। ইতি

অনি'

লেখা কোথাও-কোথাও কালিতে জেবড়ে গেছে। কোথাও অস্পষ্ট। তবে পড়া যায়। চিঠিটা পড়ে কর্নেলকে ফেরত দিলাম। কর্নেল বললেন, "মিম্মি! সত্যিই চোর লোকটা সাধু নয়। তবে সে এই চিঠিটা নেয়নি কেন, সেটাই অদ্ভুত!"

মিম্মি বলল, "চিঠি নিয়ে কী করবে? টাকাগুলো নিয়েছে।"

গৌরীদেবী বললেন, "ওতে সমীর খুচরো টাকাকড়ি রাখত। টেবিলে বা বিছানায় ফেলে রাখত। সেজন্যই আমার ওটার কথা মনে পড়েছিল। থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে ব্যাগটা দেখিনি। তাই ভেবেছিলাম, বাড়িতে রেখেছে।"

কর্নেল চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, "পুলিশকে এটা জানানো দরকার। আমিই জানাব; শুধু একটা কথা, আপনি এই ঘটনা কাকেও জানাবেন না। মিম্মি! তুমিও কাউকে বলবে না কিন্তু।"

মিম্মি বলল, "আপনি ওটা নিচ্ছেন কেন ?"

"তুমি চিঠি পড়েছ ?"

মিম্মি মাথা দোলাল। গৌরীদেবী বললেন, "অনির চিঠিটা মিম্মি আমাকে পড়ে শুনিয়েছে। আমার খুব অবাক লেগেছে। সমু ইচ্ছে করলেই ওকে বাঁচাতে পারত। কেন বাঁচায়নি জানি না।"

"আপনার ধারণা অনি বেঁচে নেই ?"

একটু দ্বিধার পর গৌরীদেবী বললেন, "সমু একবার বলেছিল যেন—অনিকে কেউ মার্ডার করেছে। প্রশান্ত মার্ডার করেছে বলেনি। প্রশান্তের সঙ্গে ওর শত্রুতা ছিল না। তবে ভেতরকার কথা কে জানে বলুন ?"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "একটু পরেই কলকাতার বাইরে এক জায়গায় যাব। ইতিমধ্যে নতুন কিছু ঘটলে ডি সি ডি ডি লাহিড়িসায়েবকে ফোনে যোগাযোগ করবেন।"

মিম্মি গেট পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এল। আবার বলল, "কর্নেলদাদু ! আপনি চিঠিটা নিলেন কেন ?"

কর্নেল আস্তে বললেন, "চোরটাকে ধরতে হবে তো !"

মিম্মি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।···

পথে যেতে যেতে বললাম, "দা মিস্ট্রি ইজ সলভড্। তবু খামোকা ছুটোছুটি করে বেড়ানোর মানে হয় না।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "খেলার দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছেছি জয়ন্ত ! বাই দা বাই, তুমি রিয়ার ভিউ মিররে একটা কালো গাড়ি লক্ষ করেছ কি ? গাড়িটা এলিয়ট রোড থেকে আমাদের পিছু নিয়েছিল। এখন আবার পিছু নিয়েছে।"

চমকে উঠে গাড়িটা দেখতে পেলাম। বিজন সেতু জোরে পেরিয়ে গিয়ে খানিকটা চলার পর স্যুইনহো স্ট্রিটে ঢুকলাম। গাড়িটা তখনও পিছনে। একটা বাঁকের মুখে কর্নেল থামতে বললেন। তারপর নেমে গেলেন।

আমিও নেমে গেলাম। কালো গাড়িটা আমাদের চাপা দেওয়ার ভঙ্গিতে জোরে ছুটে এল। দুজনে সরে দাঁড়ালাম। এক পলকের জন্য দেখলাম, গাড়িটা ড্রাইভ করছে একজন শিখ সর্দারজি। ইন্দরজিৎ সিং ?

কর্নেল বললেন, "শিগগির জয়ন্ত ! ফলো করো।"

গড়িয়াহাট রোডে পৌঁছে হারিয়ে ফেললাম গাড়িটাকে। কর্নেল নোটবইয়ে নম্বর টুকে নিচ্ছিলেন। বললেন, "নাম্বারটা নিলাম বটে, তবে ফলস্ নাম্বার হওয়াই সম্ভব।"

"কর্নেল ! লোকটা শিখ। ইন্দরজিৎ বলেই মনে হল।"

কর্নেল আস্তে বললেন, "আমার এতদিনে সত্যি বাহাত্তুরে ধরেছে, ডার্লিং ! গতকাল আমি যেন এই গাড়িটাকে ভবানীপুর থেকে কসবা অব্দি ফলো করতে দেখেছিলাম। গ্রাহ্য করিনি। এতক্ষণে মনে হচ্ছে, আমার ওই থিওরিটা কত নির্ভুল।"

"কোন থিওরিটা ?"

"অনেকসময় আমরা জানি না যে, আমরা কী জানি এবং অনেকসময় আমরা দেখি না যে, আমরা কী দেখছি।" বলেই কর্নেল স্টিয়ারিঙে হাত রাখলেন। "বাঁদিকে ঢোকো, জয়ন্ত ! কালো গাড়িটা আমাদের ফলো করার জন্য সামনের ক্রসিঙে ঘুরছে।"

খাপ্পা হয়ে বললাম, "দিনদুপুরে এই ভিড়ে এত সাহস !"

"গোঁয়ার্তুমি কোরো না। আজকাল দিনদুপুরে অনেককিছু ঘটে।"

অগত্যা বাঁদিকে ঢুকে ঘুরতে ঘুরতে শরৎ বোস রোড, তারপর চৌরঙ্গি হয়ে ঘুরে ফ্রিস্কুল স্ট্রিট হয়ে এলিয়ট রোডে কর্নেলের বাড়িতে পৌঁছুলাম। উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপছিল। আমার বৃদ্ধ বন্ধু কিন্তু নির্বিকার।

কর্নেলের ড্রয়িংরুমে ঢুকে ধপাস করে বসে বললাম, "লাহিড়িসায়েবকে ঘটনাটা জানিয়ে দিন।"

কর্নেল হাত তুলে বললেন, "ছেড়ে দাও !"

"ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, কর্নেল ! ইন্দরজিৎ সিং প্রশান্ত সান্যালের লোক। এটা অন্তত জানানো দরকার।"

কর্নেল হাসলেন। "হোক না। ওকে একটু খেলতে দেওয়া উচিত।"...

বৈশম্পায়ন রায়

কে তুমি ?

অনি।

কেন এলে ?

তুমি কী সুখে আছ দেখতে এলাম।

আমি সুখেই আছি অনি ! আমার অনেক টাকা। বাড়ি। গাড়ি। মানুষের এক-রত্তি জীবনে এ সবই তো অনেক বড় সুখ। এই সুখের জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ ইঁদুরদৌড়ে নেমেছে।

তুমি সুখে নেই, বাসুদা !

তা-ই বুঝি ? কিসে বুঝলে ?

এই যে তুমি হঠাৎ-হঠাৎ ঝিম মেরে বসে থাকো। কোনও কাজে মন লাগে না। মধ্যরাতের বাতাস কিংবা বৃষ্টিতে তুমি ভুল শব্দ শোনো। ডোরবেল বাজলে তুমি চমকে ওঠ। সিঁড়িতে শোনো কার পায়ের শব্দ। রাস্তায় যেতে যেতে বারবার পিছু ফিরে দেখে নাও কেউ তোমাকে অনুসরণ করছে কি না। তুমি—

অনি! তুমি আমাকে জ্বালিও না!

যতদিন তুমি বাঁচবে, তোমাকে এমনি করে জ্বালাতে আসব। তোমার সুখে কাঁটা হয়ে বিঁধব।

তুমি চলে যাও!

কী করে যাব ? আমি তো তোমার মধ্যেই লুকিয়ে আছি, বাসুদা! মাঝেমাঝে এমনি করে উঠে আসব। তুমি ভয় পাবে। মধ্যরাতের বাতাসের শব্দে—বৃষ্টির শব্দে—সিঁড়িতে পায়ের শব্দে। আমি তোমার পিছনের আততায়ী।

আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছিলাম। হতভাগা সমীর—

চুপ! চুপ! দেয়ালের কান আছে।

থাক্। আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি, অনি!

বাসুদা! আমি তোমার নিয়তি। সতর্ক হও।...

"স্যার!"

দেখলাম মিসেস অ্যারাথুন টেবিলের ওপাশে বসে আছে। ঘড়ি দেখলাম। "দ্যাটস্ অল, মিসেস অ্যারাথুন।"

"দা সেন্টেন্স্ ইজ নট ইয়েট কমপ্লিট স্যার!"

"য়ু ডু দ্যাট। য়ু ক্যান ডু দ্যাট। ইজন্‌ট ইট, মিসেস অ্যারাথুন ?"

পিএ মিসেস অ্যারাথুন এটা পারে। সে হাসি মুখে টাইপ করতে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের সুইচ টিপে রাম সিংকে ডাকলাম। রাম সিং সেলাম দিল এসে। বললাম, "রাম সিং! তুম হামকো হাওড়া স্টেশন পঁহুচ দেনা আউর কার লেকে ঘুমনা। মেরা কার কর্তারিজি কা গ্যারাজমে রাখ দেনা। ঠিক হ্যায় ?"

"জি সাব।"

"কারমে যাকে ব্যঠো। হাম পাঁচ মিনটকে বাদ যাতা।"

রাম সিং চলে গেল। হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম। আবার অনিকে দেখতে পেলাম। পরনে গেরুয়া শাড়ি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে লাল তিলক। হাতে ত্রিশূল। ভৈরবী!

বাসুদা !

বলো অনি !

কী দেখছ ?

তোমাকে অসাধারণ দেখাচ্ছে। দেবীর মতো !

আমি তো দেবীই। প্রশান্ত ভুল করেছিল। তুমিও, বাসুদা !

হ্যাঁ, তুমি দেবভোগ্যা ! কারণ তুমি সত্যিই দেবী। এতদিনে জেনেছি। দেবী আবার রক্ত চাইতে এসেছে। দাও।

অনি ! কেন তোমার এত রক্তের তৃষ্ণা ?

আজ আবার সেই অমাবস্যা। যে অমাবস্যার রাতে তুমি—

শাট আপ !

"স্যার !"

চোখ খুলে দেখি মিসেস অ্যারাথুন। বললাম, "থ্যাংকস্ !"

"ইওর সিগনেচার, স্যার !"

"সরি !" ওর হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে সই করে দিলাম। ও চলে গেল। উঠে দাঁড়ালাম। ড্রয়ার থেকে পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবার রিভলভার বের করে ব্রিফকেসে ঢোকালাম।

নীচের রাস্তায় এসে মনে হল, ঠিক করছি না। গাড়ির কাছে গিয়ে বললাম, "রাম সিং ! আভি পৌনে এগারা বাজ রহা। তুমকো যানে কা ক্যয় জরুরত নেহি। হামকো ঘর যানা পড়ে। আপিসমে যাও। আপনা কাম করো।"

রাম সিং গাড়ি থেকে বেরিয়ে সেলাম দিয়ে চলে গেল। লেকটাউনে ফিরে গেলাম। এক ঘন্টা লেগে গেল। দিনে দিনে ট্র্যাফিক জ্যাম বাড়ছে। আমার নিয়তি।

হাওড়া স্টেশনে ফোন করলাম। এই ট্রেনটা ধরা যাবে না। পরের ট্রেন বিকেল চারটে পনের। ঘন্টা পাঁচেকের জার্নি।

কাজের ছেলেটি আজও ফেরেনি। তাকে আর দরকার নেই। স্নান করে কিচেনে গেলাম। যেমন-তেমন একটা লাঞ্চ যথেষ্ট। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

কে ?

অনি।

আবার কী ?

কেমন সেজেছি দেখ বাসুদা !

ফিল্মস্টারের মতো। তোমার ভৈরবীসাজ বদলে এলে কেন, অনি ?

তোমাকে ছুঁতে পাব বলে।

তুমি আমাকে ঘৃণা করতে !

এখনও করি।

কেন অনি ?

প্রথম সমুদ্র দেখার স্মৃতি। তুমি আমাকে ঘৃণা উপহার দিয়েছিলে। আমি দিয়েছিলাম প্রেম। ভেবেছিলাম সমুদ্র থেকে প্রেম নিয়ে ফিরব। ফিরেছিলাম ঘৃণা নিয়ে। সেই থেকে পুরুষ জাতটার ওপর আমার ঘৃণা।

প্রশান্তকে তুমি—

না !

প্রশান্তের সঙ্গে তুমি বিয়ের আগের রাতে—

না !

সতের বছর তুমি প্রশান্তের সঙ্গে—

না ! না ! না !

তা হলে কি আমি ভুল বুঝেছিলাম ?

সে তুমিই জানো !

কিন্তু আবার কেন জ্বালাতে এলে, অনি ?

তুমি আমাকে ভোলোনি। ভোলো না। সমস্ত সময় তোমার সব ভাবনার তলা দিয়ে গোপনে আমি বয়ে চলেছি। তোমার ভাবনার তলায় আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, বাসুদা ! আমাকে মাথা তুলতে দাও।

এই তো দিয়েছি।

আমাকে দেখ !

এই তো দেখছি।

তা হলে কেন আজ বিকেলের ট্রেনে তুমি—

শাট আপ !

প্রেসারকুকার শিস দিল। চমকে উঠলাম। কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম জানালার দিকে। তারপর লকেটটা দুহাতে তুলে ধরলাম। ক্ষমা করো প্রভু ! তুমি আমাকে এতদিন শক্তি দিয়ে এসেছ। টার্গেটে পৌঁছুনো পর্যন্ত সাহস দাও।

কিছুক্ষণ পরে সামান্য একটু খেয়ে উঠে পড়লাম। খাদ্য এত বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছে দিনে-দিনে। আমি সত্যিই সুখে নেই।

দুটোয় কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে ফোন করলাম। ওঁর কাজের লোকটি বলল, "বাবামশাই তো নেই। বাইরে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে।"

অরিজিৎকে ফোন করলাম। অরিজিৎ বলল, "ডোন্ট ওয়ারি বাসু! প্রশান্তকে আমরা শিগগির পাকড়াও করে ফেলব। সে এখনও কলকাতা ছেড়ে পালাতে পারেনি। আর শোনো, পুরনো রেকর্ড ঘেঁটে একটা কেস পাওয়া গেল। অনামিকা সেনকে খুনের দায়ে প্রশান্তের নাম ওয়ান্টেড তালিকায় আছে।"

"অনি ওয়জ মার্ডার্ড? অরিজিৎ! কী বলছ তুমি!"

"হ্যাঁ। প্রশান্ত ওকে খুন করে অ্যামেরিকা পালিয়েছিল। কেসটা এখনও ঝুলছে। কাজেই দুটো খুনের অভিযোগ ঝুলছে তার নামে।"

"থ্যাংকস্ অরিজিৎ। বাই দা বাই, কর্নেল—"

"কর্নেল গেছেন কাঁটালিয়াঘাটে এক সাধুর দর্শনে।"

ফোন রেখে দিলাম।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার

কাঁটালিয়াঘাটে অনেক বছর আগে একবার এসেছিলাম। শ্মশান এলাকায় তখন ঘন জঙ্গল ছিল। জগন্নাথ প্রজাপতির একটা ঝাঁকের খোঁজ পেয়েই আসা। ওড়িশায় এই প্রজাতির প্রজাপতি অনেক দেখেছি। এখন এখানে সেই জঙ্গল নেই। তাই জগন্নাথ প্রজাপতিও হয়তো আর নেই। কাঁটালিয়াঘাট রীতিমতো শহর হয়ে উঠেছে। ট্যুরিস্ট লজ শ্মশানের কাছাকাছি। কিন্তু সেখানে ঠাঁই নেই। অমাবস্যার জাগ্রত কালীদর্শনে সরকারি কর্তাদের বড় ভিড়। অগত্যা হোটেল সম্রাটে গিয়ে ঠাঁই পেলাম।

চারতলা নতুন হোটেল। একেবারে গঙ্গার ধারে। আশ্বস্ত হলাম শুনে যে, হোটেলক্যান্টিনে কফি অঢেল মেলে। চারতলায় উত্তর-পূর্ব কোণের ডাবলবেড স্যুট। এয়ারকন্ডিশনের ব্যবস্থা আছে। ব্যালকনিতে বসে গঙ্গার সৌন্দর্য দেখলাম কিছুক্ষণ। বাইনোকুলারে পাখি খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। জয়ন্ত বলল, "হালদারমশাইয়ের খোঁজ করা উচিত ছিল।"

বললাম, "ওঁকে যথাসময়ে পেয়ে যাব। চিন্তা কোরো না।"

উর্দিপরা হোটেলবয় কফি দিয়ে গেল। কফি খেতে খেতে জয়ন্ত বলল, "প্রদীপবাবুর দল কোথায় উঠেছে—"

"ডার্লিং! এখন ওসব কথা নয়। গঙ্গাদর্শনে মন দাও!"

জয়ন্ত হাসল। "আপনি চিন্তাভাবনার তালে আছেন। ওকে বস্! চুপ

করলাম।"

জয়ন্ত ঠিকই ধরেছে। আমি ভাবতে চাইছিলাম। অনির চিঠিটা আমাকে ধাঁধায় ফেলেছে। চিঠির কাগজ আর কালি দেখে মনে হয় খুব পুরনো। সমীর এই চিঠি ব্যাগে রাখল কেন? আবার চোর সেই ব্যাগ চুরি করে একটা ফালতু কাগজও ফেলে রাখল না, শুধু চিঠিটা রেখে দিল? সমস্ত পরিকল্পনাটা যেভাবে সাজিয়েছি থিওরির আকারে, শুধু এই জায়গাটুকুতে কাঁচা হাতের কাজের ছাপ দেখা যাচ্ছে। এর কারণ কী? 'দ্বিতীয় ব্যক্তি' কি ভয় কিংবা উত্তেজনায় আর মাথার ঠিক রাখতে পারছে না? ভুল করে বসছে? এরপর আরও ভুল করে বসবে?

বরাবর দেখেছি, এটাই হয়। খুনী নিজের অগোচরে নিজের ছাপ রেখে যায়। এই চিঠিটা কি আরেকটা রেড হেরিং? নাহ্! ঝট করে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো ঠিক হবে না।

কফি শেষ করে উঠে পড়লাম। সূর্য ডুবতে চলেছে। বললাম, "চলো জয়ন্ত! বেরিয়ে পড়া যাক।"

একটা সাইকেলরিকশো নিয়ে অবধূতজির আশ্রমে গেলাম। শ্মশান এলাকা থেকে উত্তরে বেশ কিছুটা এগিয়ে সুন্দর আশ্রম। চারিদিকে পাঁচিল এবং তার ওপর কাঁটাতারের বেড়া। ভেতরে ফুলবাগিচা। বড়বড় গাছের গোড়া মসৃণ লাল সিমেন্টে বাঁধানো। ভিড় করে ভক্তরা বসে আছে এখানে-ওখানে। একটা নাটমন্দিরে সংকীর্তন চলেছে। মাইক্রোফোনের আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল।

একজন লোককে জিজ্ঞেস করলে সে অবধূতজির ডেরা দেখিয়ে দিল। ধাপে-ধাপে লাল পাথরের সিঁড়ির ওপর চওড়া বারান্দা। হলঘর। বিশাল দরজা। হলঘরে একদল পুরুষ ও মহিলা করজোড়ে বসে আছে। শেষদিকটায় একটা লালপাথরের বেদী। এখনই উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। বেদীতে বসে আছেন ধ্যানস্থ এক সন্ন্যাসী। দেখেই চিনতে পারলাম। এঁর ছবি লকেটে এবং সুমিতবাবুর ঘরে দেখেছি।

জয়ন্ত আমার পাঁজরে খোঁচা দিল। তার দিকে তাকালে সে সামনের দিকে চোখের ইশারা করল। দেখলাম, হালদারমশাই ধুতিপাঞ্জাবি পরে করজোড়ে বসে আছেন।

আমার চেহারায় কী আছে জানি না, অথবা লোকে আমাকে সায়েব ভাবে। একজন লোক এসে চাপাস্বরে বলল, "সামনে গিয়ে বসুন স্যার! আসুন! আমি

নিয়ে যাচ্ছি।"

সামনের সারিতে একজোড়া সায়েব এবং মেমসায়েবও দেখতে পেলাম। যেমন-তেমন পোশাক। আজকাল সায়েবমেমরা দলেদলে এদেশে এসে সাধুসন্ন্যাসীদের ভক্ত হয়ে যাচ্ছে। সামনে গিয়ে বসে হালদারমশাইয়ের চোখে চোখ পড়তেই উনি একটু হেসে চোখের ইশারায় কী যেন বললেন, বুঝলাম না। বাইরে থেকে মাইক্রোফোনের শব্দ এসে কানে ধাক্কা দিচ্ছে। আমি মাইক্রোফোন একেবারে সহ্য করতে পারি না।

ধ্যানভঙ্গ হল প্রায় আধঘণ্টা পরে। অবধূতজি প্রসন্ন হেসে চোখ খুললেন। তারপর জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ করলেন। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গি করার সঙ্গে সঙ্গে হলঘরের সবাই মেঝেয় মাথা ঠেকাল। জয়ন্ত পর্যন্ত।

আমি মাথা নোয়াইনি সেটা অবধূতজির চোখে পড়েছিল। আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে সহাস্যে বললেন, "কী হে বিজ্ঞানপ্রচারসমিতির সদস্য! লড়তে এসেছ? এখনও লড়ার সময় হয়নি। অমাবস্যালগ্নে লড়াই হবে। লৌকিক শক্তির সঙ্গে অলৌকিক শক্তির লড়াই।"

আমি করজোড়ে বললাম, "আজ্ঞে না। আমি একজন ট্যুরিস্ট।" বলেই মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলাম।

অবধূতজি খুশি হলেন। বললেন, "লৌকিকের মধ্যেই অলৌকিক লুকিয়ে আছে। একটা বীজ থেকে বিশাল মহীরুহ হয়। একটি ক্ষুদ্র গাছ থেকে সুন্দর নানা বর্ণের ফুল ফোটে। শূন্য থেকে পূর্ণ। আবার পূর্ণ থেকে শূন্য। সবই শূন্যের খেলা।" অবধূতজি শূন্যে হাত ঘুরিয়ে একটি জবাফুল সৃষ্টি করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। দুহাতে কুড়িয়ে মাথায় ঠেকালাম।

উনি আবার গম্ভীর স্বরে স্তোত্রপাঠ করলেন। পাঠ শেষ করে বললেন, "এবার সব উঠে পড়ো বাবামায়েরা। আমি নিভৃতে পূজার আয়োজন করব। রাত বারোটায় লৌকিক-অলৌকিকের মহারণ হবে। মিনিস্টার, জজসায়েব, এম পি, এম এল এ, পুলিশ অফিসার সবাই আসবেন। তাঁদের সামনে পরীক্ষা হবে আমার শক্তির। ওঠ, উঠে পড়ো সব।"

প্রণাম করে সবাই উঠে বেরিয়ে গেল। হালদারমশাই আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। অবধূতজি ধমক দিলেন, "মলোচ্ছাই! এটা দেখছি আঠায় সেঁটে গেছে যে! বেরো বলছি হতচ্ছাড়া!"

হালদারমশাই বেজার মুখে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম, "আমার একটা গোপন কথা আছে," বলে জয়ন্তকে চলে যেতে ইশারা করলাম। জয়ন্ত চলে গেল।

অবধূতজি হাসলেন। "তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ভেবো না।"

"আপনি যে কংকালের মুখে সিগারেট—"

"চুপ! চুপ! অন্য কথা থাকে বলো।"

"আমি একটা সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি।"

অবধূতজি বিরক্ত হয়ে বললেন, "সমস্যা মিটে যাবে। বলেই তো দিলাম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।"

"কথাটা আপনি শুনুন! আমি আপনার আশ্রমফান্ডে যথাসাধ্য টাকাকড়ি দেব। আপনার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে আমার আস্থা আছে বলেই—"

"শিগগির বলো!"

"আমার এক ভাগনি বছর আটেক আগে নিখোঁজ হয়ে গেছে। গতরাতে স্বপ্নে আপনার দর্শন পেলাম। আপনি বললেন, আমার আশ্রমে এস। ভাগনির খোঁজ পেয়ে যাবে।"

অবধূতজি ভুরু কুঁচকে বাঁকা চোখে তাকালেন আমার দিকে। "কী নাম তোমার ভাগনির?"

"অনামিকা সেন।"

অবধূতজি চমকে উঠলেন। আস্তে বললেন, "কে আপনি?"

"অধমের নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।" বলে পকেট থেকে অনামিকার ছবিটা ওঁকে দেখালাম।

উনি হাত থেকে ছবিটা ছিনিয়ে নিয়ে ফের বললেন, "আপনি কে?"

"কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।"

অবধূতজির চোখ দিয়ে জল গড়াতে দেখলাম। ভাঙা গলায় বললেন, "ছবিটা আমার কাছে থাক। আপনি পরে আসুন। রাত সাড়ে এগারোটায়।"

"আপনি কাঁদছেন কেন অবধূতজি?"

"এই হতভাগিনীর জন্য।"

"অনামিকাকে আপনি চিনতেন?"

অবধূতজি বেদী থেকে নেমে এলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। উনি বললেন, "গৃহত্যাগ আর সংসারত্যাগ এক কথা নয়। আমি গৃহত্যাগী। কিন্তু সংসারত্যাগী নই। কে সংসারত্যাগী হতে পারে? কেউ না। এই আশ্রম আমার সংসার। আমি মহাশ্মশানে শবসাধনা করেছি। কিন্তু মায়াকে জয় করতে পারিনি। তাই

আমার চোখে কান্না দেখছেন আপনি। আর ওই কথাটা বললেন, অনামিকাকে আমি চিনতাম কি না। চিনতাম। একজন তার মাথায় গুলি করে তাকে মেরেছিল। বলুন, আর কী জানতে চান?"

"হেমাঙ্গবাবু! আপনি—"

"চুপ! চুপ! আপনি যে-ই হোন, আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন।" অবধূতজি চোখ মুছলেন। "যা অতীত, তা অতীত হয়েই থাক। অতীতকে জাগাতে নেই কর্নেলসায়েব!"

"কিন্তু আপনিই অতীতকে জাগিয়ে রেখেছেন হেমাঙ্গবাবু!"

"অতীত নিজে থেকেই জেগে আছে।"

"একটা কংকালের মধ্যে?"

"একটা কংকালের মধ্যে।" বলে অবধূতজি ছবিটা দেখতে থাকলেন। একটু পরে ফের বললেন, "আমি আট বছর ধরে এই দিনটির প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি জানতাম, এইদিন কেউ এসে এই হতভাগিনীর কথা জানতে চাইবে। কর্নেল সরকার! আপনি যে-ই হোন, রাত সাড়ে এগারোটায় আসুন। নিভৃতে কথা হবে।"

"হেমাঙ্গবাবু, কংকালটি কি অনামিকার?"

অবধূতজির চোখ জ্বলে উঠল। "আজ রাতে কংকাল বলবে, সে কে ছিল। তার মুখেই শুনবেন। এখন আপনি চলে যান।"

"আপনি আজ রাতে বিপন্ন!"

অবধূতজি বাঁকা হাসলেন। "অনামিকার আত্মা আমার রক্ষী। আপনি চলে যান। আমার পুজোয় বিঘ্ন ঘটাবেন না।"

পকেট থেকে অনির চিঠিটা বের করে ওঁকে দিলাম। "এটা কি অনির হাতের লেখা?"

চিঠিটা পড়ার পর শ্বাসপ্রশ্বাসে মিশিয়ে অবধূতজি বললেন, "না। অনির হস্তাক্ষর নয়।"

"হেমাঙ্গবাবু! আপনি বিপন্ন।"

"আপনি চলে যান!"

"অনির খুনী বিজ্ঞানপ্রচারসমিতিকে আপনার পরিচয় ফাঁস করতে পাঠিয়েছে। সমিতির প্রদীপ মিত্র আপনার পূর্বাশ্রমের সমস্তকিছু জেনে গেছেন। অনির খুনী তাঁকে এক লক্ষ টাকা দেবে, যদি তিনি আপনার কাছে হেরে যান।"

"জানি, জানি। প্রদীপ দলবল নিয়ে এসেছে। চ্যালেঞ্জ লেটার পাঠিয়েছে।

কিন্তু আপনি এতে নাক গলাতে আসবেন না। অনির আত্মা আজ জেগে উঠবে। সে এক ভয়ঙ্কর অলৌকিক শক্তি। সে তার হত্যাকারীকে শাস্তি দেবে।"

"কে সেই হত্যাকারী, হেমাঙ্গবাবু?"

"আপনি স্বচক্ষে সব দেখতে পাবেন। অনির আত্মা তাকে আকর্ষণ করে আনবে।"

"ছবি আর চিঠিটা ফেরত দিন। ওটা আদালতের একজিবিট। কারণ খুনীকে আমি কাঠগড়ায় তুলতে চাই। অনিকে খুনের মামলার মেয়াদ আইনত এখনও শেষ হয়নি।"

ছবি ও চিঠি ফেরত দিয়ে অবধূতজি পিছনের দরজা দিয়ে চলে গেলেন। আমি বেরিয়ে এলাম। জয়ন্ত ও হালদারমশাই একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। আমাকে দেখে হালদারমশাই বললেন, "কিছু বুঝলেন কর্নেলস্যার?"

"নাহ্। আপনি কোথায় উঠেছেন?"

"থানার সেকেন্ড অফিসার কেশব আমার রিলেটিভ। তার কোয়ার্টারে আছি।" হাঁটতে হাঁটতে হালদারমশাই বললেন। "সম্পর্কে পিসতুতো ভাই। কথায় কথায় কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে এল আর কী!"

জয়ন্ত বলল, "উপমাটা লাগসই হল না হালদারমশাই!"

"অ্যাঁঃ?" হালদারমশাই অদ্ভুত শব্দে হাসলেন। "ক্যান হইল না?"

"সাপ বেরুনোর কথা বললেন!"

"হঃ। অই হইল আর কি!

বললাম, "খোঁজখবর কতটা এগোলো বলুন হালদারমশাই?"

হালদারমশাই একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে বললেন, "অবধূতজি এখানে এসেছেন বছর আটেক আগে। সঙ্গে ওনার সাধনসঙ্গিনী ছিল।"

"সাধনসঙ্গিনী?"

"তা-ই হবে। মোটকথা একজন স্ত্রীলোক ছিল। খুব সুন্দরী স্ত্রীলোক।" হালদারমশাই আবার অদ্ভুত ফ্যাঁচ শব্দে হাসলেন। "সাধনসঙ্গিনী কার সঙ্গে কাট করেছিল। অবধূতজি তান্ত্রিক শক্তির জোরে আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু আকর্ষণের ডিগ্রি বড় বেশি হওয়ায় তার বডি ফেরত পান। ডেডবডি কর্নেলস্যার! বুঝলেন তো?"

"বুঝলাম। তারপর?"

"তারপর বডির ওপর বসে শবসাধনা করে সিদ্ধিলাভ হল। যে কংকাল

সিগারেট টানে, সেটা সেই সাধনসঙ্গিনীর।"

"কিন্তু কংকালের সিগারেট টানা সম্পর্কে স্থানীয় লোকের বক্তব্য কী?"

হালদারমশাই থমকে দাঁড়ালেন। "কথায় বলে স্বভাব যায় না মরলে। জীবদ্দশায় স্ত্রীলোকটি নাকি সিগারেট টানত। কেউ-কেউ স্বচক্ষে দেখেছে।" বলে হঠাৎ কণ্ঠস্বর নামিয়ে আনলেন। "হলঘরের পেছনে অবধূতজির ডেরা। কাল রাত্রে হলঘরে উনি যখন ভক্তদের জ্ঞান দিচ্ছেন, আমি ডেরায় ঢুকলাম। খাটের তলায় একটা পুরনো তোরঙ্গ ছিল। তালা ছিল না। সেটার ভেতর স্ত্রীলোকের কাপড়চোপড় দেখলাম। খানকতক লেটার ছিল। লেটারগুলি এনে আপনাকে দেখাচ্ছি। আপনি কোথায় উঠেছেন?"

"হোটেল সম্রাটের চারতলায়। স্যুট নম্বর বাইশ।"

"আপনারা চলুন! আমি আসছি।" বলে হালদারমশাই ডানদিকে একটা পোড়ো জমি দিয়ে শর্টকাট করতে গেলেন। ওদিকটা অন্ধকার। হালদারমশাই টর্চের আলোয় লম্বা পা ফেলে হাঁটছিলেন।

কালীপুজোর রাত্রি। ভিড় এবং প্রচণ্ড মাইক চারদিকে। একটা সাইকেলরিকশো ডেকে হোটেলে ফিরলাম।

কিছুক্ষণ পরে ব্যালকনিতে বসে কফি খেতে খেতে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "অবধূতজির সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল বলতে আপত্তি আছে?"

বললাম, "অবধূত বলে নিজেকে প্রচার করলেও উনি যথার্থ অর্থে অবধূত নন। এটুকু তোমার বোঝা উচিত।"

"বুঝলাম না!"

"খাঁটি অবধূতের এরকম সভ্যভব্য আশ্রম থাকে না। ইনি মডার্ন গডম্যান।"

জয়ন্ত একটু বিরক্ত হল। "ঠিক আছে। গডম্যানের সঙ্গে কী কথা হল?"

চুরুট ধরিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, "সমীরবাবুর ব্যাগে পাওয়া চিঠি আর অ্যালবামে রাখা অনামিকার ফোটো দেখিয়ে জানতে চাইছিলাম, এই মেয়েটিই চিঠিটি লিখেছে কি না।"

"কী বললেন উনি?"

"সরি ডার্লিং। হাতের তাস এখন দেখাব না।"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলল, "তা হলে এই অবধূত—সরি, গডম্যান বুজরুক নন?"

"নাহ্। খাঁটি গডম্যান। তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন।"

জয়ন্ত হেসে ফেলল। "ভ্যাট্! আমি বিশ্বাস করি না। কংকালকে দিয়ে

সিগারেট টানানো ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। গডম্যান প্রদীপবাবুর কাছে হেরে ভুট হবেন।"

একটা চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল। চিন্তা অথবা দুর্ভাবনা। হয়তো কোনও সাংঘাতিক বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য আসন্ন। হ্যাঁ, জয়ন্ত ঠিকই বলেছে, ওটা ম্যাজিক। কিন্তু প্রদীপ মিত্রকে এমন করে লড়িয়ে দিল কে? কে চেয়েছে অবধূতের পূর্বাশ্রম এবং কীর্তিকলাপ ফাঁস হোক? তার মানে হেমাঙ্গবাবুকে অতীতের বিবর্ণ পর্দা ছিঁড়ে সামনে আনতে চাইছে কেউ। প্রশান্ত সান্যালই কি নেপথ্যের সেই নায়ক? কিন্তু এতে তার কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? প্রশ্নের ঝাঁক আমাকে ঘিরে ধরল। সুমিতবাবুর স্টুডিওতে যে ছবি ছিল, সেটা নষ্ট করার কারণই বা কী? প্রশান্ত সান্যাল কেন এ কাজ করবে? সমীরবাবুর ব্যাগে অনামিকার জাল চিঠিই বা কেন সে প্ল্যান্ট করল? এই সব কিছু যেন তার দিকেই সন্দেহের কাঁটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

জয়ন্ত বলল, "কর্নেল! আমার মনে হচ্ছে, প্রদীপবাবু একটা সাংঘাতিক রিস্ক নিচ্ছেন।"

"হ্যাঁ। তা নিচ্ছেন।"

"গডম্যানের চেলাদের হাতে ধোলাই খাবেন প্রদীপবাবু! একেবারে রামধোলাই যাকে বলে।"

"এ সম্ভাবনা অস্বীকার করছি না। অন্তত একটা হুলুস্থুলু বেধে যাবে। সেই সুযোগে—"

আমি হঠাৎ থেমে গেলে জয়ন্ত বলল, "সেই সুযোগে কী হবে? আহ্, বলুন না!"

"ডার্লিং! গডম্যান বিপন্ন।"

"আপনি ওঁকে একটু হিন্ট দেননি?"

"দিয়েছি।" চুরুটে একটা জোর টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে রাখলাম। "হেমাঙ্গবাবু এই কেসে একজন ইম্পর্ট্যান্ট উইটনেস্। হয়তো তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্যই এই আয়োজন, জয়ন্ত! একটা হুলুস্থুলের সুযোগ নিয়ে কেউ—"

জয়ন্ত আমার কথার ওপর বলল, "হেমাঙ্গবাবুকে কোথায় পেলেন?"

"সরি! অবধূতজি বা গডম্যান বলাই উচিত ছিল।"

জয়ন্ত খুব অবাক হয়ে বলল, "মাই গুডনেস! তাহলে অনির মামা হেমাঙ্গবাবুই এই গডম্যান? আশ্চর্য কর্নেল! কেন যেন এই কথাটা আমার মনে অস্পষ্ট ভেসে আসছিল। কিন্তু সত্যিই কি তা-ই?"

একটু হেসে বললাম, "দ্যাটস্ রাইট, ডার্লিং !"

"আই সি ! কিন্তু কী করে জানলেন এই গডম্যানই হেমাঙ্গবাবু ?"

"আমার থিওরির সঙ্গে খাপ খায় বলে।"

"কিন্তু থিওরির তো একটা ভিত্তি থাকবে ?"

"বেদীতে যখন হেমাঙ্গবাবু বা গডম্যান বসে ছিলেন, তাঁর পেছনের দেয়ালে এক ভৈরবীর ছবি ছিল। তুমি লক্ষ করোনি। ভৈরবীর মুখে অনামিকার মুখের আদল আমার চোখ এড়ায়নি।"

জয়ন্ত এত অবাক হল যে, কোনও কথা বলতে পারল না। আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। একটু পরে আস্তে বলল, "আপনার কাঁটালিয়াঘাটে ছুটে আসার পেছনে একটা কিছু ছিল বুঝতে পারছি।"

জবাব দিলাম না। হালদারমশাই এসে গেলেন এতক্ষণে। ব্যালকনিতে একটা বেতের চেয়ার এনে দিল জয়ন্ত। আলো জ্বেলে দিতে বললাম ওকে। হালদারমশাই তিনটে পুরনো চিঠি বের করে বললেন, "তিনখানা ইনল্যাণ্ড লেটারেই শ্রী হেমাঙ্গ সেনগুপ্ত অ্যাড্রেসি। কেয়ার অব শ্রীশ্রী ভূতানন্দ অবধূত, কাঁটালিয়াঘাট। কী কারবার !"

চিঠিগুলো দ্রুত খুলে দেখে নিলাম। তারপর বললাম, "চিঠিগুলোর বদলে তোরঙ্গটা হাতিয়ে আনলে ভাল হত হালদারমশাই !"

হালদারমশাই ঝটপট নিস্যি নিয়ে বললেন, "আনব। কিন্তু হেমাঙ্গ সেনগুপ্ত কেডা ?"

জয়ন্ত বলে উঠল, "হালদারমশাইকে কেসটা জানিয়ে দিন না কর্নেল !"

হালদারমশাইর চোখদুটো গোল হয়ে গেল। বললেন, "ক্যাস ? কী ক্যাস ?"

হুঁ, এবার পুরো কেসটা ওঁকে জানানো উচিত। সংক্ষেপে পুরো ঘটনা বললাম। শোনার পর উনি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। বললাম, "না হালদারমশাই, তোরঙ্গ হাতানোর রিস্ক আর নেওয়া ঠিক হবে না। বরং প্রদীপবাবুদের দলে গিয়ে ভিড়ুন। জানবার চেষ্টা করুন কে ওঁর পেছনে আছে। এক লাখ টাকার রিস্ক নিতে কে ওঁকে প্রোভোক করেছে, খুঁজে বের করুন। পরবেন না ?"

"পারব।" বলে হালদারমশাই সবেগে প্রস্থান করলেন।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বলল, "এটা ভালই হল। নইলে হালদারমশাই তোরঙ্গ চুরি করতে গিয়ে হয়তো কেলেংকারি বাধাতেন।"

বললাম, "প্রদীপ মিত্রের ক্যাম্পে গিয়েও তা বাধাতে পারেন। আসলে

হালদারমশাই নাটকীয়তার পক্ষপাতী।"

জয়ন্ত উঠে গিয়ে ব্যালকনিতে ঝুঁকে গঙ্গাদর্শন করছিল। একটু পরে হঠাৎ ঘুরে বলল, "কর্নেল! আমার একটা থিওরি শুনুন।"

"বলো।"

"হেমাঙ্গবাবু সম্ভবত জানেন, কে ওঁর ভাগনিকে খুন করেছিল।"

"জানাটা স্বাভাবিক। ভাগনিকে ভৈরবী সাজিয়ে আশ্রমে রেখেছিলেন। এই আশ্রমেই সে খুন হয়েছিল কি না সেটা অবশ্য বলা কঠিন। কারণ হালদারমশাই লোকের কাছে শুনেছেন, ভৈরবীর ডেডবডি ফেরত পেয়েছিলেন।"

"প্রশান্তই খুনী। প্রশান্তের কাছ থেকে অনামিকা চলে এসে মামার আশ্রমে ছিল। সমীরবাবুকে লেখা চিঠি পড়লে বোঝা যায়, সে প্রশান্তের কাছ থেকে পালিয়ে আসার জন্য সমীরবাবুর সাহায্য চেয়েছিল। সমীরবাবু হয়তো ছুটে এসেছিলেন এবং খুনের ঘটনার তিনিও ভাইটাল সাক্ষী। তাই তাঁকে মরতে হয়েছে।"

"জয়ন্ত! থিওরি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। অনেকসময় ধূর্ত খুনী ভুল থিওরি গড়ে তোলার জন্য গোয়েন্দাকে অলক্ষ্যে থেকে সাহায্য করে। ফাঁদ ডার্লিং! ফাঁদ। সেই থিওরি আসলে একটা ফাঁদ।"

"কী সর্বনাশ! আপনি সেই ফাঁদে পা দেননি তো?"

"দিয়েছিলাম। এখন সরে এসেছি।"

"কী করে টের পেলেন আপনি ফাঁদে পা দিয়েছিলেন?"

একটু হেসে বললাম, "টেলিফোন ডাইরেক্টরি আমাকে শেষ মুহূর্তে রক্ষা করেছে। নইলে লাল হেরিং মাছের পেছনে অনর্থক ছুটে বেড়াতাম।"

জয়ন্ত আবার ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। "টেলিফোন ডাইরেক্টরি?"

আস্তে বললাম, "দ্যাটস্ রাইট, ডার্লিং!"...

জয়ন্ত চৌধুরি

'টেলিফোন ডাইরেক্টরি' কথাটি আমার মাথার ভেতর অনেকক্ষণ মাছির মতো ঘুরল। তারপর মগজের কোনও স্নায়ুতে সেঁটে রইল। এ এক জ্বালাতন। সমস্যা হল, আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুকে বরাবর এইরকম প্রস্তরমূর্তি হয়ে যেতে দেখেছি—কোনও জটিল রহস্যের পর্দা তোলার পূর্বাভাস এটা। এ সময় প্রশ্ন করেও জবাব পাওয়া যায় না। যদি বা যায়, তা অসংলগ্ন এবং আরও ধাঁধার সৃষ্টি করে।

ঘরে বসেই ডিনার খেলাম আমরা। তখন রাত প্রায় সাড়ে নটা; তারপর ব্যালকনিতে গিয়ে রাতের গঙ্গা দেখতে দেখতে বললাম, "কখন বেরোবেন ?"

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। চোখ খুলে বললেন, "কোথায় ?"

"কী আশ্চর্য! কংকালের সিগারেট টানা দেখতে যাবেন না ?"

"ও! হ্যাঁ।" অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন কর্নেল।

হাসতে হাসতে বললাম, "আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।"

"নাহ্। তত কিছু না।" কর্নেল যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে একটু হাসলেন। "আমি অনামিকার কথা ভাবছিলাম। জয়ন্ত! অনামিকা সেনের সম্পর্কে তোমার মনে কোনও ইমেজ ভেসে উঠছে না ?"

"উঠছে বৈকি! খেলুড়েটাইপ মেয়ে। পাকা অভিনেত্রী।"

"কেন অভিনেত্রী বলছ ?"

"অভিনেত্রী নয় ? ভৈরবী সেজেছিল—আপনি ছবি দেখেছেন আশ্রমে।"

"হুঁ। আরও ব্যাখ্যা কর।"

"আপনি আমাকে নিয়ে খেলতে বসেছেন কর্নেল! উদ্দেশ্য কী ?"

"অনামিকাকে আরও ভালভাবে জানতে চাই।"

"কিন্তু আমার কাছ থেকে কী করে জানা যাবে ? পঁচিশ বছর আগে আমার বয়স ছিল পাঁচ।"

"হোপলেস, ডার্লিং! তুমি কিছু ইনফরমেশন হাতে পেয়েছ। সেই থেকে একটা ইমেজ নিশ্চয় তোমার মনে গড়ে উঠেছে।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "অনামিকার ছিল তিন-তিনটে বাঘা প্রেমিক।"

"প্রেমিকদের সম্পর্কে তোমার বিশেষণটা বড্ড বেয়াড়া।"

"বাঘা প্রেমিক বলতে আপত্তি কী ? রূপের আগুনে পতঙ্গের ঝাঁপ কথাটা ক্লিশে হয়ে গেছে।"

"হুঁ, বলো।"

বৃদ্ধ ঘুঘুমশাই কি এ ভাবে সময় কাটাতে চাইছেন ? বললাম, "আর বেশি কিছু বলার মতো ইনফরমেশন আমার হাতে নেই।"

"কেন ? তোমার মনে হয় না, অনামিকা তার মামার কথায় চলত ?"

"হ্যাঁ। বুঝতে পারছি, আমাকে দিয়ে আপনি অনামিকাকে গড়ে তুলতে চাইছেন। আমি বোকা হতে পারি। তবে আপনার হয়ে চিন্তা করতে রাজি নই।"

কর্নেল চোখ বুজলেন। একটু পরে বললেন, "তান্ত্রিক শক্তি বলে কিছু থাক বা না-ই থাক, অনামিকা তার মামার খুব বশীভূত ছিল। মামাকে কি সে ভয়

পেত ? এটাই প্রশ্ন।"

"বস্! এটা কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার গল্প হয়ে গেল! অবশ্য মডার্ন কপালকুণ্ডলা এবং মডার্ন তান্ত্রিক।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "মডার্ন কপালকুণ্ডলা বলেই অনামিকা সিগারেট টানত।" বলে একরাশ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ঘড়ি দেখলেন। "ওঠ ! বেরুনো যাক।"

হোটেল থেকে বেরুনোর সময় হালদারমশাইকে আসতে দেখলাম। আমাদের দেখে উনি গেটের কাছে থমকে দাঁড়ালেন। কাছে গেলে চাপা স্বরে বললেন, "প্রদীপ মিত্রের পেছনে কলকাতার এক বিজনেসম্যান আছে। প্রদীপবাবুর ওয়াইফ এসেছেন সঙ্গে। কী যেন নামটা—"

কর্নেল বললেন, "চিত্রা।"

"হঃ! চিত্রা দেবীর লগে পাঁচ কথা কইয়া ভাব জমাইলাম। ওনারে সাপোর্ট করলাম।"

কর্নেল বললেন, "ওঁরা কোথায় উঠেছেন ?"

"রানী বরদাসুন্দরী স্কুলে দুইখান ঘর পাইছেন। স্কুলে পূজা ভেকেশন।"

"আপনি আর একবার যান চিত্রাদেবীর কাছে। তাঁকে বলুন আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমাকে উনি চেনেন।"

"হোটেলে ডাকব ?"

"না। স্কুলের কাছাকাছি কোথাও। চলুন!"

স্কুলবাড়িটা রেললাইনের কাছাকাছি। নিরিবিলি জায়গা। চারদিকে গাছপালা আর একটা পুকুর। পুকুরের পাড়ে একটা বটতলায় আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। এখান থেকে স্কুলবাড়িতে আলো ও মানুষজন দেখা যাচ্ছিল।

মিনিট পনের-কুড়ি পরে হালদারমশাই হন্তদন্ত ফিরে এসে বললেন, "চিত্রাদেবী আপনারে ডাকলেন। হাজব্যান্ডেরে আপনার কথা কইয়া দিলেন, কী কাণ্ড! প্রদীপবাবু আপনারে চেনেন। উনিও কইলেন, কর্নেলসায়েবরে লইয়া—" বলে হালদারমশাই ঘুরলেন। "ওই দ্যাখেন, প্রদীপবাবু আসছেন!"

আমরা স্কুলের গেটে গেলাম। আমার বয়সী এক ভদ্রলোক কর্নেলকে নমস্কার করলেন। বেশ মারকুট্টে চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি। একটু ঔদ্ধত্য আছে ভাবভঙ্গিতে। বললেন, "চিত্রা এইমাত্র আমাকে বলল আপনার কথা। কী আশ্চর্য! একে বলে মশা মারতে কামান দাগা।"

চিত্রাকে আসতে দেখা গেল। এসেই কর্নেলের পায়ের ধুলো নিলেন। কর্নেল

বললেন, "আমি আপনার ক্যাম্পে ঢুকব না প্রদীপবাবু ! আমি শুধু একটা কথা জানতে চাই। কে আপনাকে এক লাখ টাকার রিস্ক নিতে প্রভোক করেছে ?"

প্রদীপবাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। "আমাকে প্রোভোক করবে ? আমি বিজ্ঞানী। যুক্তিবাদী। আপনাকে কে এমন উদ্ভট কথা বলল ?"

চিত্রা বললেন, "আমি বলেছি।"

প্রদীপবাবু হাসলেন। "কর্নেলসায়েব ! চিত্রার ধারণা, আমি অন্যের কথায় নাচি। একেবারে ভুল।"

কর্নেল বললেন, "আপনি এক লাখ টাকা বাজি ধরেছেন। যদি হেরে যান ?"

"আমি হারব না। ওই ম্যাজিকটা আমি জানি। পুতুলনাচের টেকনিক প্রয়োগ করা হয়। অবধূতের হাতে থাকে কালো সুতোর গোছা। নীল আলোতে কালো সুতো দেখা যায় না। অবধূত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাত নাড়েন বা দাড়ি চুলকোন। ওটাই কৌশল।"

"তা হলে আপনি এসে দেখে গেছেন ব্যাপারটা ?"

"নিশ্চয়। তা না হলে কোন সাহসে বাজি ধরব ?"

আমি বললাম, "কংকাল সিগারেট টানে। এর টেকনিকটা কী ?"

"কংকালের দাঁতের ফাঁকে সিগারেট আটকে দেওয়া হয়। ভেতরে সরু নল আছে। সেটা বেদীর তলা দিয়ে পেছনের ঘরের মেঝেয় একটা হাপরের মুখে বসানো আছে। ইলেকট্রিক হাপর। তো—"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। ম্যাজিক। কিন্তু আপনি তো এসেছেন আরেকটা উদ্দেশ্য নিয়ে। অবধূতজির পূর্বাশ্রমের গোপন তথ্য জনসমক্ষে ফাঁস করবেন।"

"করব। কারণ আমার হাতে ডকুমেন্টারি এভিডেন্ট আছে।"

"কী ভাবে তা সংগ্রহ করলেন বলতে আপত্তি আছে ?"

প্রদীপবাবু যে সত্যিই অহংকারী মানুষ, তা ওঁর হাসির ভঙ্গিতে বোঝা গেল। বললেন, "আপত্তি থাকবেই। কে বলতে পারে অবধূত আপনার মতো একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে আমার পেছনে লাগিয়েছেন কি না ? আপনি ডাবল এজেন্ট নন, কে বলতে পারে ?"

"আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নই। আপনার স্ত্রী আমার কাছে গিয়েছিলেন। আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি ওঁকে বলেছি, স্ত্রীই স্বামীর রক্ষাকবচ।"

"কর্নেলসায়েব ! আমি জানি আপনি কে। আমার অন্য সোর্স আছে জানার।"

"সেই সোর্স কি বৈশম্পায়ন রায় ?"

আমি চমকে উঠলাম। চিত্রাকেও দেখলাম খুব চঞ্চল এবং উত্তেজিত। চিত্রা কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে প্রদীপবাবু বললেন, "বলব না।"

"মিঃ রায়কে আপনি নিশ্চয় জানাননি অবধূতজি কে ছিলেন ?"

প্রদীপবাবু যেন একটু দমে গেলেন। "এ আমার প্রাইভেট সিক্রেট। কাকেও জানানোর প্রশ্ন ওঠে না।"

"জানিয়ে দিলে এক লাখ টাকার আশ্বাস পেতেন না।" কর্নেল নির্বিকারভাবে বললেন। "বাই দা বাই, আপনি সমীর রুদ্রকে চেনেন ?"

চিত্রা বললেন, "আমি চিনতাম। সে তো আপনাকে বলেছি।"

প্রদীপবাবু বললেন, "আজই চিত্রার কাছে তার কথা শুনেছি।"

কর্নেল চিত্রাদেবীকে বললেন, "বাই এনি চান্স, সমীরবাবুর সঙ্গে আপনার ইদানীং কি দেখা হয়েছিল ?"

চিত্রা আস্তে বললেন, "আপনাকে বলেছিলাম, কসবার একই বাড়ির ফ্ল্যাটে আমার দিদি থাকেন। তাঁর ঘরে সমীরবাবু আড্ডা দিতে যেতেন। কথায়-কথায় সম্প্রতি এক ভদ্রমহিলার গল্প করছিলেন। তাঁর সঙ্গে সমীরবাবুর নাকি বিয়ের কথা হয়েছিল। সে অনেকবছর আগের কথা।"

"অনামিকা সেন ?"

"হ্যাঁ।" চিত্রা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "অনামিকার মামা নাকি সাধুবাবা হয়েছেন এবং সেই তান্ত্রিক সাধক কাঁটালিয়াঘাটে থাকেন।"

"সমীরবাবু বলেছিলেন!"

"হ্যাঁ।"

"সে-কথা আপনার স্বামীকে আপনি বলেছিলেন ?"

চিত্রা তাঁর স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে মাথা দোলালেন।

প্রদীপবাবু বললেন, "আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। এরপর যা বলার, যথাসময়ে যথাস্থানে বলব।"

কর্নেল বললেন, "ডকুমেন্টস্ আপনাকে সমীরবাবু দিয়েছিলেন, তাই না প্রদীপবাবু ?"

প্রদীপ মিত্র খেঁকিয়ে ওঠার ভঙ্গিতে বললেন, "বলব না, আই রিপিট; যথাসময়ে এবং যথাস্থানে মাইক্রোফোনে সব ঘোষণা করব।"

"প্রদীপবাবু, মিঃ রায় আপনাকে এক লাখ টাকার চেক দিয়েছেন কি ?"

"বলব না।"

"সেই চেকের তারিখ দেখে নিয়েছেন কি ?"

"বলব না।"

"চেকের তারিখ দেখে নেবেন।" বলে কর্নেল চলে এলেন।

আমরা রাস্তায় পৌঁছুলে উত্তেজিত হালদারমশাই বললেন, "রহইস্য ! প্রচুর রহইস্য !"

কর্নেল বললেন, "প্রচুর রহস্যই বটে হালদারমশাই।"

হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন, "অবধূতজিই সমীরবাবুকে মার্ডার করেনি তো কর্নেলস্যার ?"

কর্নেল হাসলেন। "আপনার সন্দেহের কারণ আছে। এটুকু বলা চলে।"

বললাম, "একটা ব্যাপার বোঝা গেল। অবধূতজির ওপর অনামিকার তিন প্রেমিকেরই খুব রাগ। বলবেন, প্রশান্তবাবুর রাগের প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু ওটা ধরে নিতেই হবে। অবধূতজি—মানে, হেমাঙ্গবাবু ভাগনিকে কপালকুণ্ডলা করে রাখতে চেয়েছিলেন। সেই নিয়েই প্রশান্তবাবুর সঙ্গে অনামিকার ঝামেলা বেঁধেছিল সম্ভবত। অনামিকা নিশ্চয় মামার খুব বশীভূত ছিলেন।"

কর্নেল বললেন, "দ্যাটস্ রাইট। তবে এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। চলো, অবধূতজির আশ্রমে যাই।"

এবার রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। মাইক্রোফোন এবং বাজি পটকার উপদ্রব। অবধূতজির আশ্রমেও জনারণ্য। আশ্রমের একধারে কালীমন্দির। সেখানে পুজোর প্রস্তুতি চলেছে। কিন্তু অবধূতজিকে দেখতে পেলাম না। আমাকে ও হালদারমশাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে কর্নেল "আসছি" বলে ভিড়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন।

হালদারমশাই বললেন, "আইজকাল জনগণের মাথা বেবাক খারাপ হইয়া গেছে।"

"কেন বলুন তো ?"

"সি উইদ ইওর ওন আইজ, জয়ন্তবাবু !" বলে নস্যি নিলেন হালদারমশাই। হাঁচবার চেষ্টা করে বললেন, "পূজা দ্যাখতে আয়ে নাই। আইছে ম্যাজিক দেখতে।"

ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি, ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে সেই ইন্দরজিৎ সিং ! চমকে উঠেছিলাম। বললাম, "ওই সর্দারজিকে ফলো করুন হালদারমশাই !"

হালদারমশাই তখনই ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন। কেন ফলো করতে হবে জিজ্ঞেসও করলেন না। আমাকে কিছু বলারও সুযোগ দিলেন না। আসলে এটা ওঁর বাতিক। কর্নেলের পাখি-প্রজাপতির পেছনে ছোটাছুটির বাতিক যেমন।

ভিড় ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। তারপর দেখলাম, একদঙ্গল পুলিশ ঢুকল। গেটের দিকে পুলিশভ্যান দেখা যাচ্ছিল। একের পর এক ভি আই পি-রা আসছেন বোঝা গেল। কিন্তু তার জন্য এত পুলিশ কেন রে বাবা?

এক ভদ্রলোক গাছের গোড়া শানবাঁধানো চত্বরে বসেছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হাঙ্গামার ভয় আছে নাকি মশাই? এত পুলিশফোর্স কেন বলুন তো?"

বললাম, "জানি না।"

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টে চারপাশটা দেখে নিয়ে একটু হাসলেন হঠাৎ। "বিজ্ঞানের সঙ্গে তন্ত্রশক্তির লড়াই। বলা যায় না, দুই ফোর্সের সংঘর্ষে কী ঘটে যায়। তাই থার্ড ফোর্স হিসেবে পুলিশ আমদানি।"

ভদ্রলোক রসিক। বললাম, "আপনি এর আগে কখনও কংকালের সিগারেট খাওয়া দেখেছেন?"

"না মশাই। দেখব বলেই তো এসেছি। তবে বুঝলেন, হাঙ্গামা দেখলেই কেটে পড়ব। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!" ভদ্রলোক একটু রসেবশে আছেন মনে হল। "আজকের রাতে কারণবারি পান না করে থাকা যায় না। কাজেই দোষ নেবেন না মশাই!" বলে করজোড়ে আমাকে নমস্কারও করলেন।

আবার একদল বন্দুকধারী পুলিশ এল। তাদের দেখে ভদ্রলোক গেটের কাছে গিয়ে আরেকটা গাছের তলার বেদীতে বসলেন। বোঝা গেল, একটা কিছু ঘটলেই নিরাপদে পালাতে পারবেন।

কর্নেল কোথায় গেলেন কে জানে! বিরক্তি লাগছিল। হালদারমশাইও গেলেন তো গেলেন। আর আসার নাম করছেন না। কিন্তু ইন্দরজিৎ সিং এখানে কেন এল? ফ্রিল্যান্স জার্নালিজমের জন্য? যা ঘটতে চলেছে, অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং তন্ত্রশক্তির ডুয়েল, বিদেশি কাগজে ভাল খাবে। কাজেই একজন ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট আসতেই পারে। শুধু স্কুইনহো স্ট্রিটে একই চেহারার একজন শিখ ভদ্রলোকের আচরণ উদ্বেগজনক। তবে এমনও তো হতে পারে, সেই ভদ্রলোক ইন্দরজিৎ সিং নন?

ভিড় সামলাচ্ছে পুলিশ। মন্দিরের হলঘরের সামনে ঘাসের ওপর এবং রাস্তার ওপর যে-যেখানে পারছে বসে পড়ছে। হলঘরের দরজা বিশাল। কাজেই

ভেতরের দৃশ্য দেখতে অসুবিধা নেই। চারদিকে আলোর বন্যা। মাইক্রোফোনে শ্যামাসঙ্গীত এবং কখনও স্তোত্রপাঠ জলদগম্ভীর স্বরে।

দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ব্যথা ধরে গেল। না কর্নেল না হালদারমশাই কেউ ফিরে এলেন। সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরাতে যাচ্ছি, একজন গেরুয়াধারী সাধু তেড়ে এলেন - "আশ্রমের ভেতর নো স্মোকিং! ওই দেখুন, আলোর অক্ষরে লেখা আছে।"

এই সাধু নিশ্চয় আশ্রমেরই লোক। তাই ওঁকে বললাম, "সরি সাধুজি! তো এত পুলিশ কেন? হাঙ্গামার আশঙ্কা আছে নাকি?"

"নাহ্!" সাধুজি হাসলেন। "শোনেননি বিজ্ঞানপ্রচারসমিতির প্রদীপ মিত্রদের পুলিশ স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছে? এস পি সায়েব কড়া লোক। আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করেছেন।"

"কখন ওঁদের ফেরত পাঠিয়েছে পুলিশ?"

"এই তো কিছুক্ষণ আগে।"

হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নাটকীয় ঘটনাটা ঘটল না। কোনও মানে হয়?"

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার

মন্দিরের পাশ দিয়ে অবধূতজির ঘরে যাচ্ছিলাম। দু'জন সাধু আমাকে বাধা দিলেন। বললাম, "ওঁর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।"

কথাটা একটু চড়া গলায় বলেছিলাম। অবধূতজি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ইশারায় চেলাদের চলে যেতে বললেন। তারপর আমাকে ডাকলেন। কাছে গেলে আস্তে বললেন, "আপনার সময়জ্ঞান আছে। আসুন! তবে বেশি সময় দিতে পারব না। মাত্র পনের মিনিট।"

"তা-ই যথেষ্ট হেমাঙ্গবাবু!"

"চুপ! ও নামে ডাকলে আপনার সঙ্গে কথা বলব না। এমন কি—"

"ঠিক আছে।"

ঘরে ঢুকে ধূপ-ধুনোর সুঘ্রাণ পেলাম। একটা খাটে ফোমের গদি। তার ওপর গেরুয়া চাদর। অবধূতজি আসন করে বসলেন। আমি বসলাম একটা মোড়ায়।

অবধূতজি বললেন, "আগে আত্মপরিচয় দিন। কপটতা করবেন না।"

আমার নেমকার্ড দিলাম। উনি খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন, "নেচারিস্ট কী?"

"প্রকৃতিপ্রেমিক।"

অবধূতজি একটু হাসলেন। "নারীর মধ্যে প্রকৃতি আছেন। কিন্তু নারীরা তা জানে না। আমার ভাগনি অনি জানত, তার মধ্যে প্রকৃতি আছেন। আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আর দেখুন কর্নেল সায়েব, প্রকৃতির ভয়ঙ্করী শক্তি। আপনি প্রকৃতিকে দেখেছেন, চেনেননি।"

দ্রুত বললাম, "সমীরবাবুকে আপনি চিনতেন। যে—"

"কাগজে পড়েছি সে আত্মহত্যা করেছে। অনিকে ছুঁতে গিয়েছিল ওই মস্তান শূকরশাবক। তার শাস্তি পেয়েছে।"

"আপনি কেন প্রশান্ত সান্যালের সঙ্গে অনির গোপনে বিয়ে দিয়েছিলেন?"

"আপনি কেন এসব কথা জানতে চান?"

"অনির হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে চাই বলে। মামলার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি অবধূতজি!"

অবধূত এক মিনিট তাকিয়ে রইলেন নিষ্পলক চোখে। তারপর শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'প্রশান্তর কাছ থেকে অনি পালিয়ে এসেছিল আমার এই আশ্রমে। এমনি কালীপুজোর রাতে তাকে কেউ ডেকে নিয়ে যায়। পরদিন মহাশ্মশানে তার মড়া পাওয়া গিয়েছিল। তাকে গুলি করে মেরেছিল প্রশান্ত।"

"প্রশান্ত মেরেছিল আপনি জানেন?"

"ধ্যানবলে জেনেছি।"

"অবধূতজি! আমার ধ্যানবল নেই। তদন্ত করে জেনেছি, প্রশান্ত অনিকে খুন করেনি।"

অবধূত ভুরু কুঁচকে তাকালেন।— "কে খুন করেছিল?"

"যে সমীর রুদ্রকে খুন করেছে।"

"কে সে?"

"বলব। তার আগে আপনি বলুন কেন প্রশান্তর সঙ্গে অনির বিয়ে দিয়েছিলেন?"

অবধূত চুপ করে রইলেন।

বললাম, "আমি বলছি। প্রশান্ত আপনাকে অনেক টাকা দিয়েছিল। আপনি আশ্রমের জমি কিনেছিলেন সেই টাকায়। অনির মায়ের বাড়ি বিক্রির টাকায় আপনার ওই মন্দির।"

অবধূতের চোখ জ্বলে উঠল। কিন্তু আত্মসংবরণ করে বললেন, "আপনি অনেক কিছু জানেন তা হলে।"

"জানি। এ-ও জানি, সেই অমাবস্যার রাতে সমীর এসে ডেকে নিয়ে যায় অনিকে। আপনি আমাকে মিথ্যা বলেছেন, চিঠিটা অনির লেখা নয়। অবধূতজি, চিঠিটা অনিরই লেখা। সমীর সম্ভবত ঠিক সময়ে বহরমপুর পৌঁছুতে পারেনি। তাই আপনার আশ্রমে এসেছিল অনির খোঁজে। আপনি তাকে শূকরশাবক বলছেন। কিন্তু সে আপনার আতিথ্যেই ছিল।"

অবধূতজির চোখে জল দেখতে পেলাম। আস্তে বললেন, "সমীর এসেছিল কালীপুজো দেখতে।"

"ওটা নিতান্ত ছল, অবধূতজি! তবে সমীর জানত না, যাকে সঙ্গে নিয়ে অনির খোঁজে এসেছে, সে আসলে অনিকে খুন করার উদ্দেশ্যে সমীরকে ব্যবহার করছে। শ্মশানের ওখানে যেতেই সে অনিকে গুলি করে পালিয়ে যায়। সমীরও পালাতে বাধ্য হয়। আপনি জানেন এসব কথা। সমীর আপনাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল। সে-চিঠি আমার হাতে এসেছে।"

অবধূতজি খাট থেকে নেমে তলায় হাত ভরে তোরঙ্গ টেনে বের করলেন। তখন বললাম, "থাক্ অবধূতজি! আমার কথা শুনুন। তোরঙ্গ যেমন আছে থাক্।"

তোরঙ্গ খুললেন অবধূত। গেরুয়া শাড়ি জামা দেখিয়ে বললেন, "এতে রক্ত লেগে আছে অনির। কিন্তু চিঠি আপনার হাতে গেল কী করে?"

"যে-ভাবে হোক, গেছে। আপনি দয়া করে বসুন।"

অবধূত বসলেন। বললেন, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।"

"আপনি সমীরের চিঠিতে আপনার ভাগনির খুনীর নাম জেনেও কেন পুলিশকে তা বলেননি?"

অবধূত তাকালেন। নিষ্পলক চাহনি।

বললাম, "খুনী আপনাকে মাসোহারা দিতে চেয়েছিল। তার বদলে প্রশান্তের কাঁধে দায় চাপাতে বলেছিল। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। প্রশান্তকেও দোহনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তার ঠিকানা যোগাড় করতে দেরী হয়েছিল অবশ্য। প্রশান্তও এরপর আপনাকে টাকা দিতে আসত। হয়তো এবারও এসে দিয়ে গেছে। সে ২৩ সেপ্টেম্বর এসেছিল। হ্যাঁ, সমীর আপনাকে সাহায্য করেছিল প্রশান্তের ঠিকানা দিয়ে। সে-চিঠিও আমার হাতে এসে গেছে।"

অবধূত চোখ মুছে বললেন, "এত যদি জানেন, খুনীর নাম বলছেন না কেন?"

"আপনি মর্ডান গডম্যান। আপনার তাই দামী বিদেশি গাড়ি আছে। আপনি রাজসিক সুখ ভোগ করেন। এই সুখের জন্য আপনার সুন্দরী ভাগনিকে টোপ হিসেবেই ব্যবহার করেছেন।"

অবধূত চাপা গর্জন করলেন, "বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান!"

এইসময় কেউ এসে দাঁড়াল দরজার বাইরে। এদিকটায় তত আলো নেই। দেশি-বিদেশি ফুলের ঝোপ, পাতাবাহার গাছ। ঘুরেই দেখলাম ইন্দরজিৎ সিং এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে ফায়ারআর্মস্। মাত্র কয়েকটি সেকেন্ড। সে অবধূতের দিকে নয়, আমার দিকেই ফায়ারআর্মসের নল তাক করেছে। এক লাফে সরে গেলাম। গুলি গিয়ে লাগল দেয়ালে।

তারপর দেখলাম হালদারমশাই তার ওপর ঝাঁপ দিয়েছেন। ইন্দরজিৎ ধরাশায়ী হল। তার হাতের অস্ত্র ছিটকে পড়ল চৌকাঠের এধারে। অবধূত পাথরের মূর্তির মতো তখনও বসে আছেন। অস্ত্রটা কুড়িয়ে নিয়ে দরজার কাছে গেলাম। ইন্দরজিতের পিঠে বসে হাত দুটো মোচড় দিলেন হালদারমশাই? "হালার পো হালা! ঘুঘু দ্যাখছে, ফান্দ্ দ্যাখে নাই।"

বেরিয়ে গিয়ে একটানে ইন্দরজিৎ সিংয়ের পাগড়ি খুলে ফেললাম। বললাম, "বৈশম্পায়ন রায়কে ছেড়ে দিন, হালদারমশাই!"

হালদারমশাই পিঠ থেকে নেমে তার জামার কলার ধরে ওঠালেন। কৃপাণটা খুলে নিতে ভুললেন না। "কী আশ্চইর্য!" বলে তার মুখের দিকে তাকালেন হালদারমশাই।

ততক্ষণে কয়েকজন সাধু এবং পুলিশ দৌড়ে এসেছে। বাজি-পটকার শব্দ এই আশ্রমে নেই। তাই গুলির শব্দ শোনা স্বাভাবিক। একজন পুলিশ অফিসারও দৌড়ে এলেন। বললাম, "এই ভদ্রলোকের নাম বৈশম্পায়ন রায়। একে অ্যারেস্ট করুন। এস পি সায়েবকে ফোনে বলে রেখেছি। ইনি দুটো মার্ডার করেছেন। আর একটা মার্ডারের অ্যাটেম্প্ট্ করেছেন।"

পুলিশ ঘিরে ফেলল বৈশম্পায়ন রায়কে। একটু পরে খবর পেয়ে এস পি বরেন্দ্র সোম এসে পড়লেন। চারদিকে উত্তেজনা। ভিড় হটাতে পুলিশকে মৃদু লাঠি চার্জও করতে হল।

হালদারমশাই বললেন, "জয়ন্তবাবু খাড়াইয়া আছেন। যাই গিয়া—"

বললাম, "চলুন, আমিও যাচ্ছি।"

জয়ন্ত ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছিল। পুলিশ তাকে বাধা দিচ্ছিল। আমি গিয়ে বললাম, "চলো জয়ন্ত! হোটেলে ফেরা যাক্।"

জয়ন্ত উত্তেজিতভাবে বলল, "কে একজন পাঞ্জাবি এক্সট্রিমিস্টি নাকি অবধূতজিকে গুলি করেছে ?"

হাসতে হাসতে বললাম, "না ডার্লিং ! এক্সট্রিমিস্টি বা টেররিস্ট নয় । নেহাত এক ভেতো বাঙালি । অবধূতজিকে সে গুলি করেনি । ওত পেতে আমাদের কথা শুনছিল ঝোপের আড়ালে ।"

হালদারমশাই বললেন, "আমি জয়ন্তবাবুর কথায় হালারে ফলো করছিলাম । সময়মতো না ধরলে কর্নেলস্যারের বডি পড়ে যেত ।"

জয়ন্ত চমকে উঠল । "সর্বনাশ ! কে লোকটা ?"

বললাম, "বৈশম্পায়ন রায় ।"

"অ্যাঁ ?"

"হ্যাঁ ।" ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, "গোড়া থেকেই তার প্রতি আমার সন্দেহ ছিল । আমাকে দিয়ে সে বুঝে নিতে চেয়েছিল, অনামিকা সেনকে খুন করার মোডস অপারেণ্ডিতে কোনও ত্রুটি আছে কি না, যা তাকে ধরিয়ে দেবে । দৈবাৎ সমীর রুদ্রের মুখোমুখি না হলে সে আমার কাছে আসত না । আসার পর সে সমীরকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে । তার প্রথম টার্গেট ছিল প্রশান্ত সান্যাল । তাই সে একই বাড়িতে ছদ্মনামে ছদ্মবেশে ফ্ল্যাট কিনেছিল । তার পক্ষে শিখ সাজা সোজা । মুখে দাড়ি তো আছেই । তবে ভি রায়ের ওপর আমার প্রথমদিনই সন্দেহ হওয়ার কারণ টেলিফোন ডাইরেক্টরি ।"

জয়ন্ত বলল, "হ্যাঁ । বলছিলেন বটে ।"

"চলো । হোটেলে ফিরে কফি খেতে খেতে বলব ।"

হোটেলে ফিরে ব্যালকনিতে বসলাম । সারা কাঁটালিয়াঘাটে কোলাহল । মাইক্রোফোন । বাজি-পটকার আলো ও শব্দ । এই তুমুল কোলাহলের আড়ালে একটা আশ্চর্য নাটক ঘটে গেল ।

কফি খেতে খেতে জয়ন্ত মনে করিয়ে দিল—"টেলিফোন ডাইরেক্টরি !"

বললাম, "হ্যাঁ । সমীরকে ভি রায়ের নাকি দরকার । অথচ পাচ্ছে না । বিজ্ঞাপন দিতে চাইছে । কেন ? টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে সমীর রুদ্রের ঠিকানা সে সহজেই পেতে পারত । আজ সকালে মিশ্মি আমার ফোন নাম্বার পেল কী করে ? কারুর ঠিকানা খুঁজতে হলে—যদি সে মোটামুটি সচ্ছল লোক হয়, টেলিফোন ডাইরেক্টরিই আগে খুঁজবে ।"

জয়ন্ত বলল, "বাপ্‌স্ ! মাথা ভোঁ ভোঁ করছে !"

হালদারমশাই হাসলেন । "মাথা ক্লিয়ার করনের জন্য নস্যি লন ।" বলে

নসির কৌটো দিলেন। জয়ন্ত নিল না।

বললাম, "প্রশান্তর ওপর দায় চাপানোর জন্য বৈশাম্পায়ন কত কৌশল করেছিল। ধুরন্ধর লোক। পয়সাখরচ করে প্লেনের টিকিট কিনেছিল পর্যন্ত। অনামিকা সেনের চিঠি হাতিয়েছিল সমীরের কাছে। সম্ভবত যে-রাতে সমীরকে খুন করে, সেই রাতেই। কনফেস করলে জানা যাবে। আশ্চর্য ক্ষুরধার বুদ্ধি ভদ্রলোকের! জনি ওয়াকার মদের বোতল সাজিয়ে রাখা থেকে শুরু করে সবটাই রেড হেরিং সাজানো। সমীরের মায়ের সঙ্গে কসবা গিয়ে ফ্ল্যাট থেকে সমীরের হ্যান্ডব্যাগ চুরি! সেই হ্যান্ডব্যাগে অনির চিঠি প্ল্যান্টেড! এমন কি ফোন করে আমাকে তার তৈরি রেড হেরিংয়ের দিকে ছোটাতেও চেয়েছিল। স্বীকার করছি, আমি কিছুদূর ছুটেছিলামও বটে। ছ'খানা লাল চিঠির হুমকি তার নিজেরই লেখা। বলতে পারো অপারেশন রেড হেরিং। সমীর রুদ্রকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে সে আমার কাছে এসেছিল। অরিজিতের কাছেও গিয়েছিল।"

জয়ন্ত বলল, "তা হলে সমীরের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা না হলে সে তাকে খুন করত না বলছেন?"

"করত না, যদি সমীর তাকে চিনতে না পারত। সমীর তার অনিকে খুনের প্রত্যক্ষদর্শী।"

"অনিকে খুনের মোটিভ কী?"

"প্রতিহিংসা চরিতার্থ। মুখে যাই বলুক, বাসু অনির প্রেমে পড়েছিল।"

হালদারমশাই অদ্ভুত শব্দে হাসলেন। "প্র্যাম—সরি! প্রেম কী ডেঞ্জারাস!"

"হ্যাঁ হালদারমশাই! প্রেম বড্ড ডেঞ্জারাস। তবে সত্যিকার প্রেম, খাঁটি প্রেম কোটিকে গুটিক দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্রেম এবং প্র্যাম দুই-ই মিলেমিশে আছে।"

জয়ন্ত বলল, "বোগাস!"

"ডার্লিং! বৈশম্পায়নের মধ্যে খুনের ইচ্ছে জাগানোর প্রধান ফ্যাক্টর প্রশান্ত। সে সচ্ছল পরিবারের ছেলে। সে অনিকে পেয়েছে। এতে তার মতো নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলের আঁতে প্রচণ্ড লেগেছিল। মানুষের মন ছকে ফেলে বিচার করা যায় না। অনিকে খুন করার পর সে প্রশান্তকে টার্গেট করেছিল। সুযোগ পাচ্ছিল না। গত ২৩ সেপ্টেম্বর প্রশান্ত হোটেলে উঠেছিল। তাই সে সুযোগ পায়নি। আমি গতরাতে ওয়াশিংটনে ট্রাঙ্ককল করে সব জেনেছি ওর কাছে। প্রশান্ত শিগগির এসে পড়ছে।"

হালদারমশাই বললেন, "ভি রায় এত উইপন পাইল কোথায়?"

"বিদেশঘোরা লোক সে। এ দেশে যে-সব অস্ত্রপাচারকারী আছে, তাদের সঙ্গে তার ট্রেডিং কনসাল্ট্যান্সি ফার্মের যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। ফিরে গিয়ে অরিজিৎকে লড়িয়ে দেব। আমার বিশ্বাস কেঁচো খুঁড়তে এবার সত্যি সাপ বেরুবে।"

জয়ন্ত বলল, "অনির ছবিটা বাসু ইচ্ছে করেই নষ্ট অবস্থায় দিয়েছিল। তাই না?"

চুরুট ধরিয়ে বললাম, "আসলে অরিজিৎ ওকে অনির একটা ছবি দিতে বলেছিল। তাই ছবিটা দেওয়া। কিন্তু সে চায়নি ছবিটা আমি কাজে লাগাই। জয়ন্ত, ওর কালো অ্যাম্বাসাডার সারাক্ষণ আমাকে ফলো করেছে। সুমিতবাবুর বাড়ি পর্যন্ত ফলো করেছিল। সেদিন অতটা নজর দিইনি। পরে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। যাই হোক, আর এসব কথা নয়।"

বলে গঙ্গাদর্শনের জন্য উঠে দাঁড়ালাম। গঙ্গায় আলো পড়ে ঝলমল করছে; বড় রহস্যময়ী এই নদী। অনামিকা সেনের মতো গভীরগোপন রহস্যে পূর্ণ। এ মুহূর্তে গঙ্গার মধ্যে কেন যেন তাকেই দেখতে পেলাম। মন খারাপ হয়ে গেল।...

বৈশম্পায়ন রায়

কে?

আমি অনি।

কেন এলে?

তুমি কী সুখে আছ দেখতে এলাম।

আমি সুখেই আছি অনি! কারণ আমি এবার মরতে পারব। নিজে নিজেকে মেরে ফেলতে কষ্ট হত। জীবনের বড় মায়া। এখন আমাকে মেরে ফেলা হবে। সেই মৃত্যুর কোনও বাধা নেই আর। হাইকোর্ট আমার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে। না দিলে এ জীবন খুব কষ্টকর হত।

বাসুদা!

বলো!

আমাকে কেন তুমি গুলি করে মেরেছিলে? আমি তো সমীরদার ডাকে আশ্রম ছেড়ে বাইরে যাইনি। তুমি ডেকেছ বলে গিয়েছিলাম। তুমি আমার কথা শোনার আগেই—

চুপ করো অনি!

না। বলো!

আমি কুৎসিত সন্দেহ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি তোমার মামার সাধনসঙ্গিনী!

ছিঃ বাসুদা! তুমি এত নীচ!

হয়তো প্রেম মানুষকে এত নীচমনা করে।

প্রেম নয়, কুৎসিত কামনা।

তবে তা-ই। তুমি চলে যাও অনি! আমাকে সুখে মরতে দাও।...

—